কবি গোলাম মোস্তফা
ও
তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.Phil.

উপস্থাপনায়

বেগম আজিজুন নাহার

এম.ফিল ২য় পর্ব

রেজিঃ নং-৯৩/৯৫-৯৬ইং

ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

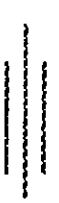

RB
E
391.44
NAK

ঢা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

১৯৯৬ইং

Dhaka University Institutional Repository

কবি গোলাম মোস্তফা
ও
তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়
বেগম আজিজুন নাহার
এম.ফিল ২য় পর্ব
রেজিঃ নং-৯৩/৯৫-৯৬ইং
ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382760

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

১৯৯৬ইং

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"কবি গোলাম মোস্তফা ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল উপাধির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ ইং শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হই। এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইচ্ উদ্দীন কর্মব্যস্ত থাকার পরও তাঁর কাছ থেকে যে উপদেশ ও সহৃদয় সাহায্য-সহযোগিতা, সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য ব্যয় করেছেন এজন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও আমার বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণও আমাকে গবেষণা কাজে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন।

382760

কবি গোলাম মোস্তফার জেষ্ঠ্যকন্যা ফিরোজা খাতুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনৈক কর্মচারী, আহমদ পাবলিকেশনের বর্তমান পরিচালকের সহযোগিতায় গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাবলী পেয়েছি। সহায়ক গ্রন্থাবলীর সংখ্যাধিক্য হেতু গ্রন্থসমূহের লেখক বা স্বত্ত্বাধিকারীর কাছ থেকে আলাদাভাবে অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে সে সবের ঋণ স্বীকার করেছি। এই সুযোগে সকলকে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নানাভাবে আরো অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতিও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমার স্বামী এবং মা আন্তরিকভাবে আমাকে উৎসাহিত করে বাধামুক্তভাবে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। তাই তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা, ১৯৯৯ইং

বেগম আঞ্জিজুন নাহার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বে যে ক'জন বাঙালী লেখক পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজে বসবাস করেও নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, সেই নবজাগরণের পথিকৃতদের একজন হলেন কবি গোলাম মোস্তফা। বর্তমান আলোচনায় তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের ইসলামী দিক সমূহকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের এক পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সৌহার্দ্য-সন্দেহ প্রীতি বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লেখকের অনেকেই ইসলামী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের লেখনী চালিয়েছেন। বিশেষ করে তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন ইংরেজ শাসনামলে বাঙালী হিন্দু -মুসলিম সম্পর্কের ইতিহাস, তেমনি এ কালের ইংরেজী ভাবধারা পূর্ব আধুনিক বাংলা কাব্যের সর্ব প্রধান লক্ষ্যণীয় সাধারণ বিষয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক।[১] এ সকল কারণে ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশকল্পে কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য বিশেষ করে তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা নিয়ে এ পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা কর্ম হয়নি বললেই চলে। তাই তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা প্রসঙ্গটি ফুটিয়ে তোলার জন্য এ অভিসন্দর্ভটি রচনার অবতারণা। বিষয়টির অবয়ব ও ভাব-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বিষয়টি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারা ও গোলাম মোস্তফা শীর্ষক আলোচনায় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

382760

অভিসন্দর্ভটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি গোলাম মোস্তফার জীবনধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কবি গোলাম মোস্তফার কর্মজীবন এবং তাঁর জীবনের কিছু বিশেষ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের নজরুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব বিষয়টিতে মুলতঃ নজরুল ইসলাম ও কবির সাথে সম্পর্কের বিতর্কিত বিষয়গুলোর যথাসাধ্য সমাধান দেয়া হয়েছে। কবি গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানী আন্দোলন ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর লেখার মাধ্যমে জাতিকে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা অধ্যায়টিতে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কবি গোলাম মোস্তফার রচিত সকল সাহিত্য কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে এ সাহিত্যকর্মগুলোর ইসলামী ভাবধারা সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। কবি গোলাম মোস্তফা রচিত গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করতঃ তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে কবি গোলাম মোস্তফা যে সকল সাহিত্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরও উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কবি গোলাম মোস্তফার সার্বিক মূল্যায়ন করে অভিসন্দর্ভটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭-১৯২০), গবেষণা অভিসন্দর্ভ) বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মে-১৯৬৭ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা	ঃ		
প্রথম অধ্যায়	ঃ	বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা ও গোলাম মোস্তফা'র আবির্ভাব	০১ - ১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	গোলাম মোস্তফার জীবন ধারা	
		গোলাম মোস্তফার জন্ম ও বংশ পরিচয়	১৬ - ২২
		গোলাম মোস্তফার শৈশব ও কাব্যের উন্মেষ	২৩ - ২৯
		শিক্ষা জীবন	৩০ - ৩২
		বৈবাহিক জীবন	৩৩ - ৩৬
		বংশধর	৩৭ - ৪৪
		ইনতিকাল	৪৫ - ৪৬
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	কর্মজীবন	৪৭ - ৫২
		নজরুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব	৫৩ - ৬১
		পাকিস্তানী আন্দোলন ও গোলাম মোস্তফা	৬২ - ৬৯
		রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও গোলাম মোস্তফা	৭০ - ৭৫
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্মে ইসলামী ভাবধারা	
		গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলী	৭৬ - ৭৯
		ইসলামী সাহিত্য	৮০ - ৮৪
		গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধ সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা	৮৫ - ৯৯
		গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী রচনায় ইসলামী প্রেরণা	১০০-১১১
		গোলাম মোস্তফার কাব্য রচনায় ইসলামী ভাবধারা	১১২-১৪১
		গোলাম মোস্তফার কথা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা	১৪২-১৪৫
		শিশু সাহিত্য ও পাঠ্য পুস্তক রচনায় ইসলামী ভাবধারা	১৪৬-১৫৭
		গোলাম মোস্তফার অনুবাদ সাহিত্য ও ছন্দ বৈচিত্র্য	১৫৮-১৭১
		গোলাম মোস্তফার গান রচনায় ইসলামী ভাবধারা	১৭২ -১৮১
		গোলাম মোস্তফার শেষ লেখা	১৮২ -১৮৪
		সাহিত্য স্বীকৃতি	১৮৫-১৯০
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	সার্বিক মূল্যায়ন	১৯১- ১৯৯
		উপসংহার	২০০- ২০২
		গ্রন্থপঞ্জী	

382760

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা

ও

গোলাম মোস্তফা'র আবির্ভাব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা ও গোলাম মোস্তফা'র আবির্ভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গোলাম মোস্তফা'র (১৮৯৭–১৯৬৪) জন্ম হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের সাথে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সম্পৃক্ত হন। তাঁর সাহিত্য–সাধনায় স্বধর্মীয় ও স্বজাতির ধ্যান–ধারণা ও ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা এবং মুল্যায়ন করতে হলে তাঁর আবির্ভাবপূর্ব এবং পরবর্তী মুসলিম সমাজের প্রেক্ষিত আলোচনা করা আবশ্যক। বিশেষ করে তৎকালীন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ধারার প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

এইদেশে মুসলমানগণের আগমন হাজার বছরেরও আগে ঘটে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বহু আগেই আরবীয় বণিক–সম্প্রদায় ও পীর–দরবেশদের আগমন ঘটেছিল এইদেশে–তারাই মূলতঃ ইসলাম ধর্মের পয়গাম নিয়ে আসেন। ধর্মীয় বাণী বহনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও জীবন যাত্রার যে বিশেষ ধরণ–ধারণের সঙ্গে ভাষা ও জীবন যাত্রার যে বিশেষ ধরন–ধারণের পরিচয় তাঁরা তুলে ধরেন, তা–ই এদেশের স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্কৃতির বুনিয়াদ রচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যে আরবী–ফারসির প্রভাবও এভাবেই পড়েছে। মুসলিম কবিরা শুধু ভাষার ঐতিহ্যকেই গ্রহণ করেননি, কাব্যক্ষেত্রে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।[১] আবদুল কাদির এই সম্পর্কে 'মাহেনও' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন– "পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহুকাল আগে থেকেই আরব বণিক ও পীর আওলিয়াদের মারফৎ ইসলামের আবির্ভাব শুরু হয়েছিল। বহু সূফী–সাধকের দৈবী ক্ষমতা ও মধুর চরিত্রের

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, বাংলা কাব্যের মুসলিম ঐতিহ্য, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬–১৮ বাবু বাজার, ঢাকা–১, ১১ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৭২, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

কথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা বংশ–পরম্পরায় স্মরণ করে আসছে। শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজী, শাহ জালাল মুজররদই–য়্যামনী, হযরত নূর কুতবে আলম ও মাওলানা কেরামত আলী এই চারজন ধর্ম নেতার ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে সার্বিক উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কর্মক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তান, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ট; ফলে দেশের এই দুই অবিচ্ছেদ্য অংশের মধ্যে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐহিত্য গঠনে স্বভাবতঃই তাঁদের ভূমিকা হয়েছিল প্রভূতভাবে কার্যকরী ও অর্থপূর্ণ।" [১]

সূফী দরবেশগণ শুধু এদেশে ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি; They raised the prestige of Islam and the Muslims; they made Islamic culture and learning a force in this country. It was their miracles and their prestige which inspired the Muslim writers of the fourteenth, fifteenth and sixteenth centuries with the pictures of the exaggerated glory that we find in Ghazivijay and Rasulvijay poems.[২]

যে বাংলা ভাষা আমাদের এত গর্বের, এত আদরের, মুসলিম আগমনের পূর্বে তাঁর রূপ তেমন অনিন্দ্য ছিল না। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বঙ্গদেশ জয়ের মাধ্যমে প্রথম এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়কে তাই 'মুসলিম যুগ' বলা যায়। বাংলাদেশের মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কাল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

১. আবদুল কাদির: পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐক্য, 'মাহে– নও' সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ ইং

২. Syed Ali Ashraf, Muslim Traditions in Bangali literature: p. 4-5.

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলা যায় মুসলিম আমলে বাংলা ভাষার বিকাশের সাথে সাথে তার আধো আধো বুলির স্ফুরণও হয়েছিল। তার আগে সাংস্কৃতিক পন্ডিতদের দৌরাত্ম্যে বাংলা ভাষাকে সুতিকাগার হতে বের করাই ছিল দুষ্কর, করলে সাধারণের জন্যে নরকাগ্নির ব্যবস্থা ছিল নিশ্চিত। মুসলমান যে সেন বংশীয় রাজাদের থেকে রাজদন্ড কেড়ে নিয়েছিল, তাঁদের আমলে এ দৌরাত্ম সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সেন রাজাদের আমলে অনেক সংস্কৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।"[১]

বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের আমল হতে বাংলা ভাষাও সাহিত্যের চর্চাও আরম্ভ হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিমগণের সেবায়, দানে, সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বাংলা ভাষা নানা গৌরবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। বাংলা ভাষার সর্ব প্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহাম্মদ সগীর আযম শাহের রাজত্বকালে 'য়ুসুফ জুলিখা' নামক কাব্য লিখে যশস্বী হন। শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'য়ুসুফ জুলিখা' এবং তৎপূর্ববর্তী বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তণ'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম দুই গ্রন্থ।[২] তাই বলা যায় সুলতানী আমল ছিল বাংলা ভাষার স্বর্ণযুগ। এই যুগে হিন্দু মুসলিম একত্রে কলম ধরেছিল, হিন্দুর মঙ্গল কাব্য আর মুসলমানগণের পুঁথি সাহিত্য বাংলা ভাষায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে। মুসলমানগণের দরাজ দানে দরিদ্র বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৩]

---

১. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল: মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং, পৃ. ২

২. মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদক), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৫৯

৩. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল: প্রাগুক্ত, পৃ. -২,

Dhaka University Institutional Repository

যে সব কবিতা মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল সেগুলো ছিল ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনের কবিতা, বিনয় প্রকাশের কবিতার, বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাসের কবিতা পাঠ করলেই ঈশ্বরের প্রতি আসক্তির পরিচয় বুঝা যায়। বিদ্যাপতি তাঁর একটি গীতে বলেছেন– "দেবতা তো কত আসে, কত চলে যায়–কিন্তু তোমার আদিও নেই, অবসানও নেই। তোমার মধ্য থেকে আমাদের আগমন এবং তোমাতেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" বিদ্যাপতির এই গীতটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় বহন করছে।[১] মধ্যযুগে সর্বপ্রথম মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটায়। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত, আরবী, ফারসি ইত্যাদি ভাষা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ হয়। মধ্যযুগের সুলতানী আমলে বাংলা ভাষার প্রতি হিন্দুগণ বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু যখন তারা দেখে যে, অন্যান্য কবিরা নিজেদের কাব্য রচনার জন্য সুলতানের নিকট হতে প্রচুর ইনাম, খেতাব ও পুরস্কার লাভ করতে লাগল, কেবলমাত্র তখনই তারা রাজদরবারে সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করল।[২]

শুধু তাই নয় দেখাদেখি অন্যান্য হিন্দু রাজাগণও তখন নিজেদের রাজসভায় বাঙালী কবি–সাহিত্যিকদিগকে সম্মান করতে লাগল। এভাবেই বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন হল এবং এর সমস্ত গৌরবই মুসলিমগণের প্রাপ্য।[৩] যে বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা ভাষার একটা বিশেষ শাখা হিসেবে পরিগণিত; মুসলিম সূফীতত্ত্বের পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন–বিরহের উপর

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল–মে–জুন, ৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৫৭

২. গোলাম মোস্তফা ঃ প্রবন্ধ সংকলণ,বাংলা ভাষার নতুন পরিচয়, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা– ১৯৬৮ইং, পৃ. ১৮১

৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত–১৮২

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত হয়েছে তার গগণস্পর্শী সৌধ। মুসলিম সাধনাতত্ত্বের আশেক–মাশুকের নবতম চিত্র অংকিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগল জীবনে।[১]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান রচিত পুঁথিও উল্লেখযোগ্য। ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে মুসলিম পুথির সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ ছিল।[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্'র রচনায় আরবী–ফারসি–উর্দু শব্দের তেমন ব্যবহার দেখা যায় না। এছাড়াও কাব্যের বিষয়বস্তু অনুসারে মুসলমানি

পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতাও প্রাধান্যপায়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে শাহ্ গরীবুল্লাহ্ পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি। তাঁর মতে, "কাব্যের ভাষাতেও এই মিশ্রিত বাংলা ব্যবহৃত হইতে থাকে। হিন্দু লেখকগণ সংস্কৃতের প্রভাবে সাহিত্যে এই সকল 'যবনিক' শব্দ অনেকটা বাদশাদ দিতেন। কিন্তু মুসলমান কবিগণ অবাধে এই আরবী–ফারসি মিশ্রিত বাংলা কাব্যে ব্যবহার করিতে থাকেন। এইরূপে এই নতুন পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়।"[৩] এই পুঁথি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'মকতুল হোসেন', 'জঙ্গনামা','শহীদের কারবালা', 'শাহনামা', 'কাছাছুল–আম্বিয়া', 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'হাতেম তাঈ', 'আমীর হামজা' প্রভৃতি। পুঁথি–সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার বাঙালী মুসলিম মানসের গঠনে এবং চিত্তবৃত্তির প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রোমান্টিক কাহিনী–কাব্যের মাধ্যমে যেমন মুসলিম মানসের সাহিত্য পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে, তেমনি ধর্মীয় ভাবধারা উজ্জীবিত হয়েছে ধর্মমূলক কাহিনী–কাব্যের মাধ্যমে। মুসলিম মানসের স্বাতন্ত্র বোধ ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি চেতনা সৃষ্টিতেও এসব পুঁথির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

১. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৩. 'মাসিক মোহাম্মদী','পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যমূলক ভাবধারা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এসব পুঁথি স্বতন্ত্র ভাষারও বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেছে।[১] চতুর্দশ শতক হতে পুঁথি সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

এরপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজগণ হিন্দুগণের সহায়তায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। ইংরেজগণ প্রায় দুইশত বছরের শাসন–শোষনে একটা জিনিস করতে সক্ষম হয়েছিল যে, মুসলমানগণ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং চর্চায় একটা যে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল সেটা প্রায় মুছে ফেলা।[২] তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলমানের সাংস্কৃতি উত্তরাধিকার ধ্বংস করতে না পারলে মুসলমান আবার নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের উপর মরণ আঘাত হানতে পারে। তাই ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের সংস্কৃতির উপর করুণ আঘাত হেনেছিল।[৩]

এই দেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর ১৮০০ সালে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের গোড়া পত্তন হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজগণ ভেদনীতির (Divied rule) সাহায্য নিল। ১৮৩৫ সালে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজী করা হল। সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি এসব ক্ষেত্রে ইংরেজগণ ভেদনীতিরই অবলম্বন করল। এতদিন ফারসি ভাষা রাজভাষা ছিল, এখন তার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে তারা রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করল। বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী রূপ দিয়ে মুসলমানগণের শিক্ষা ও প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করল।[৪]এই সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২. আবদুল মান্নান সৈয়দ : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ইং, পৃ. ১
৩. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩
৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন–"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তী কালে হেন্‌রি গিটস্ ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী–পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পন্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী–পারসী নিসূদন–যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।"[১]

১৮০০ সালে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সদ্য নিযুক্ত ইংরেজী সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কোম্পানী সরকার যে, পাঠ্যপুস্তক প্রদান করার ব্যবস্থা করেন, তাতে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামজয় তর্কালংকার ও মদন মোহন তর্কালংকার প্রমুখ পন্ডিতগণকে নিয়োগ করে সব পাঠ্যপুস্তক তৈরী করার নির্দেশ দেন। যেন পাঠ্য পুস্তকে আরবী, ফারসি, তুর্কী প্রভৃতি শব্দ কোনভাবেই প্রবেশ করতে না পারে। তার ফলে 'সীতার বনবাস', 'আলেক্ষ দর্শন' প্রভৃতি পাঠ্য তৈরী হলে তাতে ইসলাম ও মুসলিম জীবনের কোন নাম–গন্ধও ছিল না। এমনকি এদেশে প্রচলিত পালি বা প্রাকৃতি শব্দাবলীর ও অস্তিত্ব ছিল না। এ জন্য এগুলোকে প্যারিচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে "আলালের ঘরের দুলাল"নামক উপন্যাস লিখে খুব ঠাট্টা মসকরা করেছেন।[২]

---

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫

২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

William Hunter তাঁর Indian Musalmans নামক গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন The language of our Government schools, in lower Bengali is Hindu and the Masters are Hindus. The Musalmans with one conset spurded the instruction of their boys through the medium of his language of idolatry.[১] ভাষাতত্ত্ববিদ Grierson মন্তব্য করেছেন–"Literary Bengali, as now known, is the product of the present (19th) century. It direct cultivators were the Calcultta pandits who however well-meaning, have ruiend the language by their learning".[২]

এরপর বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ধারা এক স্বতন্ত্র রূপ নেয়। পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত এই সাহিত্য পুণর্গঠনের যুগে মুসলিম সাহিত্যিকগণ উল্লেখিত সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নব্য মধ্যবিত্ত সাহিত্য সংযোজন ধারায় অংশ নিতে সময় নেয় দীর্ঘ ষাট বছর।[৩] বৃটিশ শাসনের একশত বছরের বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের ধারাই বিদ্যমান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু করেন বংকিমচন্দ্র (১৮৩৮– ১৮৯৪) ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪– ১৮৭৩)। কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টা ছিল ধীর গতি সম্পন্ন।[৪] কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় মুসলমানদিগকে ইংরেজী ভাষাও শিখতে হল, সংস্কৃত বাংলাও শিখতে হল। এই পন্ডিতি বাংলায় বুদ্ধির দীপ্তি ও মার্জিত রুচিবোধ থাকলেও এভাষা

১. William Hunter : Indian Musalmans. The Primier Book House. Lahore. 1964.
২. গোলাম মোস্তফা; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৩. হাসান হাফিজুর রহমান : আধুনিক কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ইং, পৃ. ১৫৫
৪. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের বোধগম্য হয়নি। এই ভাষাকে লক্ষ্য করে বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারায় মাইকেল মধুসূদন হতে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১) পর্যন্ত অগ্রসর হতে অনেক চরাই উৎরাই পার হতে হয়েছে। তৎকালীন অনেক মুসলিম সাহিত্যিক মাইকেলের কাব্যরীতির ইংরেজী সাহিত্যের অনুসরণে মুসলিম সাহিত্য চর্চা করতেন।

সে সময়ে কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলাসহ ভারতের জনগণেরই মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে নবজাগরণ আনয়নের নিমিত্তে প্রচেষ্টা চালান। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৯)। তিনি ঘোষণা দেন যে, সাধারণ মুসলিম সমাজের ভাষা হবে বাংলা। তিনি ১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যেখানে মুসলিম সমাজের আংশিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চা করার সুযোগ পেত। এরপর সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে ১৮৬৪ সালে 'গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি' গঠিত হয় যা পরে আলীগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি' নাম ধারণ করেছিল। ১৮৭০ সালে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯–১৯২৮) 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[১] এই তিন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিকট তাই বাঙালী মুসলমান চিরকাল ঋণী। কারণ তখন এঁরা তিনজন উপলব্ধি করেন যে–বাঙালী মুসলিমগণের জন্য ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যক। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজে এই বিষয়ে ব্যাপক সাড়া জাগে। এই সম্পর্কে মুনশী আবদুল মান্নান লিখেছেন –

"বিদ্যমান আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ এটাই উপলব্ধি করতে পারেন, তা অধঃপতিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিজ সমাজকে সচেতন ও জাগ্রত করার জন্য গ্রন্থ রচনা, পত্র–পত্রিকা প্রকাশ

১. খন্দকার আবদুল (মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্বতন্ত্র সাহিত্য সাধনার ধারা সৃষ্টি করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তাঁরা এটা বিশেষভাবে অনুধাবন করেন যে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য জাতীয় সাহিত্য রচনা ও তার প্রচার অপরিহার্য। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকজন মুসলমান লেখক সাহিত্য সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী, মুন্সী আজিমুদ্দিন, মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন, শেখ আজিমদ্দী এবং আয়েন আলী শিকদার প্রমুখ।"[১]

মীর মশাররফ হোসেনও বাংলা সাহিত্যে এঁদের সমসাময়িক সময়ে আবির্ভূত হন। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার আধুনিক দিকের শক্তিশালী লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সমকালীন হিন্দুরীতির ভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি।[২] এই সময়ে সাহিত্য প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মুসলিম পরিচালিত ও সম্পাদিত বেশ কিছু পত্র–পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেন– "বাঙালী কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের চেষ্টা হয় সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, যাদের সমাজ হিতৈষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সমাজ প্রাণ ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী হচ্ছেন; মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মৌলভী সেরাজউদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ্, মীর্যা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহিম এবং শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক। এঁরা বুঝতে পারেন, বাংলার মুসলমানদের অভাব–অভিযোগ, দুঃখ –বেদনা ব্যক্ত করার জন্য চাই তার একটা বাংলা ভাষার সাপ্তাহিক মুখপাত্র। এঁদের চেষ্টায় 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়।"[৩]

---

১. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

২. ডঃ মাসুকে রসুল; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সুধাকর প্রকাশের পর ১৮৮০ সালে আজীজন নেহার –এর সম্পাদক মীর মোশাররফ হোসেন প্রকাশ করেন পাক্ষিক 'হিতকরী'। এর পরপরই প্রকাশিত হয় 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১), 'মিহির' ও ' হাফেজ' (১৮৯৪)' ' মিহির' ও 'সুধাকর' (১৮৯৪) 'কোহিনূর' (১৮৯৮) 'ইসলাম' (১৮৯৯),, ' নূর আল ইসলাম ইসলাম' (১৯০০)। এর পরপরই তিন দশকের মধ্যে আরও বেশ কিছু পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'সওগাত' (১৯২৬) এবং ' মোহাম্মদী' (১৯২৭) স্থায়িত্বের দিক থেকেও ভূমিকার দিক থেকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।[১]

এরপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্যার সৈয়দ আহমদের আলিগড় আন্দোলন উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐতিহ্য সচেতনস করে তোলে। বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সেই আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলিম বাংলার সাহিত্য সাধকেরা ইসলামী বিষয়বস্তু নিয়ে তখনই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার আবির্ভাব সেই নবজাগরণের যুগে এবং তিনিও সেই মানসের অধিকারীই ছিলেন।[২]

রবীন্দ্র যুগে আবির্ভূত এবং রবীন্দ্র প্রভাবিত কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর প্রতিভা, দীর্ঘকালের শ্রম ও সাধনায় রবীন্দ্র যুগের 'প্রথম সার্থক মুসলিম কবি' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলা সাহিত্যে অর্জন করেন একটি বিশিষ্ট স্থান।[৩] রোমান্টিক মানস–প্রবণতা এবং কাব্যের আংগিক ও রূপরীতির দিক দিয়ে অনেকটা রবীন্দ্র প্রভাবিত হলেও, কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্বেই

১. খন্দকার আব্দুস মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল (সম্পাদক) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩. দ্রষ্টব্য ঃ গোলাম মোস্তফা'র কাব্য গ্রন্থাবলী, আব্দুল কাদির রচিত ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজ-নির্ভর বিষয় বস্তু আহরণের মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর রাখেন। মূলতঃ রবীন্দ্র-বলয়ের কবি হলেও সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কাব্যরীতির অনুসারী ছান্দসিক কবি গোলাম মোস্তফা পরবর্তীকালে কাব্যের ভাষা, আংগিক ও রূপরীতির দিক থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্বারাও অনেকখানি প্রভাবিত হন। তিনি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য ভিত্তিক রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।[১]

গোলাম মোস্তফার যখন সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ এবং কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে সেকালে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালী মুসলমান সমাজ ছিল শিক্ষা এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ।পলাশীর বিপর্যয়ের সুদীর্ঘকাল পরও ইংরেজ শাসনাধীনে শোষণ-বঞ্চনার শিকারে মুসলিম সমাজ ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পুঁথি সাহিত্যের যুগ অনেক আগে অবসিত এবং মাইকেল মধুসুদন দত্ত থেকে বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগের সূচনা হলেও কাব্যের এই বিবর্তন ধারা এবং ক্রম অগ্রসর মানবতার সঙ্গে গভীর সংযোগের অভাবে রবীন্দ্র যুগেও অনেক মুসলমান কবি মাইকেলী কাব্য রীতির অনুসরণ করেছে।[২]

গোলাম মোস্তফা সেই সময়ের পটভূমি সম্পর্কে লিখেছেন-"বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ভাবধারায় মুসলমানদের জাতীয় সত্তা যে, সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইতে পারিতেছে না, তাহার জন্য যে স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটিয়াছে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাংলা ভাষা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের হস্তেই লালিত ও পালিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের গাফলতির ফলে তার তালিম কিন্তু পুরাদস্তুর মুসলিম জনোচিত হয় নাই। পুঁথি সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তার ধারা ও আদর্শে কিছুটা ত্রুটি ঘটিয়াছিল। নিজেদের শৈথিল্য অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার ফলে এই ভাষা কালে কালে তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কতিপয় ইংরেজ পাদ্রী ও হিন্দু পন্ডিতের মিলিত চেষ্টায় বাংলা ভাষার রূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। এতদিন বাংলা ভাষা ছিল আরবী–ফারসি শব্দ মিশ্রিত হিন্দু–মুসলমানের সাধারণ ভাষা। কিন্তু এখন হইতে সংস্কৃতমুখীন করিয়া তুলিলেন, ফলে মুসলমানদিগের বাংলা জবান কোনঠাসা হইয়া গেল। রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট হইয়া হিন্দু বাংলা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল; মুসলিম বাংলা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া অবজ্ঞার অন্ধকারে মুখ লুকাইল। এক শতাব্দী পরে মুসলমানদের আবার চৈতন্যোদয় হইতেছে। বাংলা ভাষাকে তাহারা আবার আপনার করিয়া লইবার সাধনায় মগ্ন হইয়াছে।"[১]

গোলাম মোস্তফার আবির্ভাবকালে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮–১৯৫১), কবি মোজাম্মেল হক (১৮৫৫–১৯৬০), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২–১৯৩৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯–১৯৩১) প্রমুখ কবি–সাহিত্যিকগণ। এঁরা অনগ্রসর তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে জাগরণের বাণী শোনায়। কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা', মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা', শেখ ফজলুল করিমের 'গীতি–কবিতাবলী' ও সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' মুসলিম বাংলার সাহিত্য সাধনার আধুনিক নিদর্শন হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।[২]

১. গোলাম মোস্তফা : আমার চিন্তাধারা, স্টুডেন্ট ওয়েজ বাংলা বাজার, ঢাকা –১৯৬২ ইং, পৃ. ৬৩

২. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আদর্শের মূলমন্ত্রে জাতীয় সত্তার উজ্জীবন কামনায় এ যুগের মুসলমান কবিগণ বিশেষ করে মোজাম্মেল হক (ভোলা), সৈয়দ এমদাদ আলী, শেখ হাবিবুর রহমান প্রমুখ কবিরাও ছিলেন উদ্দীপ্ত ও উন্মুখর। এ ঐতিহ্যের ধারাই গোলাম মোস্তফার মানসচেতানায় ও তাঁর কবি কর্মে এবং অন্যান্য রচনায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পূর্বসুরী ও সমসাময়িক অনেক মুসলিম কবির মতই তিনি স্বজাত্যবোধ এবং ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্যরচনা ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।তৎকালীন মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার পটভূমিতে 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতির বদলে সামাজিক ও জাতিগত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারটি বড় করে দেখেন।[১]

সাতশত বছরের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হস্ত চূত্য হবার ফলে সে কালের মুসলিমগণের চিত্ত বিক্ষোভপূর্ণ ছিল। বিশেষত ঃ তখনকার মুসলমানগণের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য রচনায় জড়িত ছিলেন, তাঁদের জন্য সাহিত্য ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র, মূলতঃ তারা স্বপ্ন দেখতেন ইংরেজদের হাত থেকে হৃতরাজ্য পুণরুদ্ধারের জন্য। তাদের ভাবনা–চিন্তা, ধ্যান–ধারণায় ছিল একটা নতুন চেতনা বোধ ও জাগরণের সুর।[২]

হাসান হাফিজুর রহমান তার আধুনিক কবি ও কবিতা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন–"ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্য সাধকগন মুসলিম অস্তিত্বের স্বাভাবিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা–পথ খোঁজার জন্যই লেখনি চালনা করতেন, একান্ত ভাবে অনুরক্ত ছিলেন তাঁরা বিস্মৃত জাতীয় ঐতিহ্য ও সম্পত্তির প্রতি। তাজমহলের সৌন্দর্য তাঁরা দেখতেন বটে, কিন্তু সর্বাধিক চিন্তা করতেন সে

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬–৭

Dhaka University Institutional Repository

যুগের ঐশ্বর্য–বিলাস ও অপরিসীম গৌরব–গরিমা আবার কি করে ফিরে পাওয়া যায়।"[১] খেলাফত ও অসহযোগ আন্দলোনের পটভূমিতে চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকে গোলাম মোস্তফা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা এবং মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণাকে তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেন। তাইতো তিনি লিখেছেন–

"কবি সাহিত্যিকেরা যে নিজের লেখা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে তার উদ্দেশ্য শুধু চিত্তবিনোদন বা প্রশংসা অর্জন নয়। মানুষ যে কোন মূল্যবান সম্পদ, তার কোন নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করে রাখতে চায়। কবি যে–সম্পদ তার মানস–গহণ থেকে উদ্ধার করে আনে, তা সে রাখবে কোথায় ? নিজের মধ্যে ধরে রাখা সে নিরাপদ মনে করে না। জীবন শেষ হলে তার সম্পদ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই সে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বা স্থায়ী আশ্রয় চায়। সেই আশ্রয় হচ্ছে মানব সমাজ। তার লেখা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে তাই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। লেখকের সঙ্গে তাই সমাজের কথা তাকে ভাবতে হয়। লেখকের ভাবও চিন্তাধারা যদি সমাজ–মনে সংক্রমিত না হয়, বা নিখিল বিশ্বে তার ঠাঁই না মেলে, তবে সে মরে যায়, তার সৃষ্টিও মরে যায়। এই জন্যই তাকে সমাজ–সচেতন হতে হয়। আমার লেখায় এ নীতিই আমি অনুসরণ করি। ব্যক্তিসত্তাকে আমি বর্জন করি না, সমাজ–সত্তাকেও অস্বীকার করি না। ব্যক্তি–সত্তাকে ভালবাসি বলেই সমাজ–সত্তাকে ভালবাসি। কারণ সমাজ–চেতনা আত্ম–চেতনারই ব্যাপক রূপ।"[২]

আর তাই তিনি সারা জীবন সমাজ সচেতন হয়ে ইসলামী সাহিত্যের অনুসরণে ইসলামী সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন অবলীলায়।

---

১. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
গোলাম মোস্তফার জীবনধারা

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার জন্ম ও বংশ পরিচয়

গোলাম মোস্তফা তৎকালীন যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমান জেলা) মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ২২শে ডিসেম্বর ১৮৯৭ইং, (১৩০১ বঙ্গাব্দ, ৭ইং পৌষ) রবিবার। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। সেকালে মুসলিম সমাজে কুষ্ঠি রাখা হত না, তাই তিনি কত সালে জন্মেছেন তা বলা যায় না। তবে "আমার জীবন স্মৃতি"–তে গোলাম মোস্তফা নিজে এ সম্পর্কে লিখেছেন –

"আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায় যে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে শৈলকূপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় দুই বছর কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমার প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তবে এটাঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয়, সে দিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ই পৌষ, রবিবার।"[১] তাই একথা বলা যায় যে, সার্টিফিকেট অনুসারে তাঁর জন্ম হয় ১৮৯৭ইং।তিনি একটি ছোট ছড়ার মাধ্যমে নিজ জন্মস্থান সম্পর্কে লিখেছেন–

"খুলনা' আমার মাসী–পিসী
'যশোর' আমার মা
ঝিনাইদহ তার মহকুমা,
আর মনোহরপুর গাঁ।"[২]

গোলাম মোস্তফা তৎকালীন মনোহরপুর গ্রামের একশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম 'কাজী পরিবার' এ জন্ম নেয়। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারটি ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার নিবেকেষ্টপুর গ্রামের আদি নিবাসী।[৩] গোলাম মোস্তফার পিতা

---

১. গোলাম মোস্তফাঃ প্রবন্ধ সংকলণ, সম্পাদনায় মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা–১, ১৯৬৮ইং, পৃ.১২৮

২. আশরাফুল হাবীব (সম্পাদক), কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা, যশোর সমিতি, ঢাকা, ১৯৯০ইং দ্রষ্টব্য।

৩. এ জামানঃ যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার (প্রথম খন্ড), প্রকাশক–এ, বি, এম আশরাফ উজ্জামান, লতিফ মঞ্জিল, নওয়াপাড়া রোড, ঘোপ, যশোর, অক্টোবর ১৯৯৮ইং, পৃ. ১৮০,আরও দ্রষ্টব্যঃ কবির জন্ম স্থান নিবেকেষ্টপুর গ্রামটির উচ্চারণ নিয়ে দ্বিমত আছে। যেমন–কেউ লিখেছেন নিবে–কৃষ্ণপুর, আবার কেউ লিখেছেন নিভে–কৃষ্ণপুর।গোলাম মোস্তফা'র স্বয়ং লেখা 'নিবেকেষ্টপুর' নামটি অভিসন্দর্ভটিতে ব্যবহার করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

মনোহরপুর বিয়ে করেন এবং এরপর থেকে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করেন। উল্লেখ্য, এই আদি নিবাস অনুসারে সুসাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন তাঁদের আত্মীয়।

১৯৪৬ সালে গোলাম মোস্তফা ফরিদপুর জেলা স্কুলে যখন হেডমাষ্টার ছিলেন তখন ফরিদপুরে তাঁর পিতৃপুরুষের আদিনিবাস স্থলে যান। সেখানে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ সম্পর্কে যে পরিচয় পান তার তথ্য অনুসারে গোলাম মোস্তফার স্বয়ং বর্ণনা করেছেন এভাবে–"যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন পাবনা জেলার দুলার আজিম চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত জমিদার। আব্বার কোন এক পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ রওশন মুন্সী আজিম চৌধুরী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে দুলাতে যান এবং চৌধুরী সাহেবের অনুরোধে তিনি তথায় একটি মাদ্রাসা চালনার ভার গ্রহণ করেন। নিবেকষ্ট পুর থেকে দুলা বেশী দূরের পথ নয়। তখনকার যুগে আলিম কারিদের খুব কদর ছিল। লেখাপড়া জানা লোকদের মুন্সী খেতাব ছিল। বলাবাহুল্য কাজী খেতাবের চেয়ে মুন্সী খেতাব কোন ভাবেই নিম্ন মর্যাদার ছিল না। কাজী সাহেবরা তাই ধীরে ধীরে মুন্সী সাহেবে রূপান্তরিত হলেন। লোকেরা তাঁকে কাজী সাহেব না বলে মুন্সী সাহেব বলতেন।"[১]

অতএব বোঝা যায় যে, এই পরিবারের অনেককাল আগে থেকেই বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্য ছিল। বাংলা ভাষাতেও তাঁদের পান্ডিত্য ছিল। এছাড়াও তাঁরা নিয়মিত আরবী–ফারসি ভাষার চর্চা ও সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করতেন।[২] সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবার হিসেবে এ পরিবারটি ছিল অল্পসংখ্যক খান্দানী পরিবারের অন্যতম।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ এই সম্পর্কে লিখেছেন–"গোলাম মোস্তফার পরিবারের যে পটভূমি এবং এ সংক্রান্ত যে সব তথ্যাদি পাওয়া যায়, তা থেকে

১. এ জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম, মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল–মে–জুন, সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

এটা স্পষ্ট যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষা–সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ হলেও, সে যুগেই উল্লেখিত পরিবারের ছিল সাহিত্য সংস্কৃতিক চর্চা এবং গোলাম মোস্তফা পরিবারিক ও ঐতিহ্যিক সূত্রেই সাহিত্য চর্চার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, অনেকটা উত্তরাধিকারও অর্জন করেছিলেন।"[১]

গোলাম মোস্তফার পিতামহ কাজী গোলাম সরওয়ার যথাক্রমে বাংলা, আরবী ও ফারসি ভাষার সুপন্ডিত ছিলেন।[২] তিনি একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন কবি ছিলেন। মনোহরপুর গ্রামের পাশেই ছিল বিজুলিয়া গ্রাম। সেই গ্রামে ইংরেজরা দরিদ্র মুসলিম চাষীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তাদের দিয়ে জোর পূর্বক ফসলের মাঠে ফসলের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। শেষ পর্যন্ত অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত কৃষকগণ ইংরেজদের অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। গোলাম সরওয়ার নীলকরদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরোধিতা করে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।[৩] ঐ কবিতার বর্ণনায় তিনি ইংরেজদের নির্যাতন, নীপিড়নের কাহিনী সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন। তাই কবিতাটি নির্যাতিত বিদ্রোহী জনগণের প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও তিনি গান রচনা করেন। তাঁর এ সব রচনা হারিয়ে গেছে স্মৃতির অতল তলে।[৪] এই কবিতাটি উদ্ধার করা গেলে সেই দিনের অত্যাচারে কাহিনী সকলে জানতে পারত।

গোলাম মোস্তফার পিতা কাজী গোলাম রাব্বানী পেশায় স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তিনিও বাংলা ভাষায় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও তিনি

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ: গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ইং পৃ. ১০.
২. নাসির হেলাল: জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশন, ১৯৯৮ ইং, পৃ. ২৪
৩. আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, ছোটদের জীবনী গ্রন্থ, বন্দে আলী মিয়া, কবি গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬ইং, পৃ. ১৯
৪. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং [১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা] পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

আরবী, ফারসি ও কিছু ইংরেজী ভাষা জানতেন।[১] তিনি আঞ্চলিকভাবে পল্লী কবি বা গ্রাম্য কবি হিসেবে মনোহরপুরবাসীর নিকট পরিচিতি ছিলেন। সে সময়ে তাঁদের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা দহলিজে সান্ধ্য আসার জমত। সেই আসরে তিনি সুললিত কণ্ঠে শ্রেতাদের সুর করে পড়ে শোনাতেন–বিদ্যাসুন্দর, জঙ্গনামা 'গুলেবাকাওয়ালী', অন্নদা মঙ্গল, কাসাসুল আম্বিয়া, আমীর হামজা ইত্যাদি গ্রন্থ যখন তাঁর কণ্ঠে ভেসে আসত সুমধুর ত্রিপদী বা পয়ারছন্দের রুমী, হাফিজ, নিজামী, সাদী প্রমুখ কবির কবিতার ছন্দ তখন শ্রোতারা অপলক নয়নে চেয়ে থাকত ও উপভোগ করত।[২]

গোলাম মোস্তফা'র পিতা বই সংগ্রহ করতে পছন্দ করতেন। এ সব বই দিয়ে তিনি 'পারিবারিক গ্রন্থাগার' তৈরী করেছিলেন। তিনি তৎকালীন বংগবাসী, তিহবাদী, মিহির, সুধাকর, মোসলেম হিতৈষী, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। সেগুলোও তিনি পারিবারিক গ্রন্থাগারের সংরক্ষণ করতেন। তিনি মনোহরপুর ও দামুকদিয়া গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩]

গোলাম মোস্তফার পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল লিখেছেন –"কালচক্রের বিবর্তনে বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে তখন দুর্দিনের ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার। কিন্তু মেঘের বুকে বিদ্যুচ্ছটার মতো মাঝে মাঝে কোনো পরিবারের দৃষ্ট হতো জীবনের স্পন্দন। মনোহর পুরের কাজী পরিবারটি ছিল তেমনি একটি ভাগ্যবান পরিবার। রাজনীতি ও অর্থনীতি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও এ পরিবারের শিক্ষা–সংস্কৃতি চমক ছিল আর ছিল সাহিত্যের নিয়মিত চর্চা।"[৪]

---

১. এ. জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৭

২. ডঃ খালেদ মাসুকে রাসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩. আশরাফুল হাবীব (সম্পাদক), কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা, যশোর সমিতি, ঢাকা–১৯৯০ ইং দ্রষ্টব্য ঃ

৪. ডঃ খালেদ মাসুখের রাসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার পাশাপাশি এই পরিবারটি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ছিল। ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও স্বধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা ছিল পরিবারটিতে। আর তাই গোলাম মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ, 'ইসলামের প্রতি অনুরাগ' যা পরবর্তী জীবনে তাঁর কাব্য, সাহিত্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত।[১]

গোলাম মোস্তফার পিতা গোলাম রাব্বানীর প্রথমাস্ত্রী বিবি শরীফুন্নেসা। তাঁর গর্ভে এক কন্যা বড়ু এবং দুই পুত্র কাজী গোলাম মোস্তফা ও কাজী গোলাম কাওসার এর জন্ম হয়। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র পুত্র গোলাম রসূল-এর জন্মের সময় তিনি মারা যান। আবার গোলাম রব্বানী তৃতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে তিন সন্তানের জন্ম হয়। তারা হলেন-এক ছেলে কাজী গোলাম মোর্তজা এবং দুই মেয়ে মাজু(পেয়ারা) ও খুকী। বড়ু, মাজু ও খুকী এরা খুবই অল্প বয়সে মারা যায়।গোলাম রব্বানীর প্রথম স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তানই আমাদের কবি গোলাম মোস্তফা।[২]

গোলাম মোস্তফার মাতা বিবি শরীফুন্নেসা সুশিক্ষিতা, ধর্মপরায়ণ, প্রতিভাময়ী ছিলেন। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হলো- তিনি সর্বদা উপমা, শ্লোক, ছড়া, স্বরচিত মধুর বাক্যে কথা বলে মানুষকে আকর্ষিত, মুগ্ধ ও অভিভূত করতেন। কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন তাঁর দাদী প্রসঙ্গে লিখেছেন-" বড় দাদী অত্যন্ত মিশুক ও পরোপকারী, উদার প্রফুল্ল চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সব সময় শ্লোক দিয়ে স্নেহ ভরে কবিতার মত সরলভাবে কথা বলতেন।"[৩]

---

১. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২. আশরাফুল হাবীব (সম্পাদক), প্রাগুক্ত দ্রষ্টব্য

৩. মতিউর রহমান রহমান মল্লিক (সম্পাদক), নতুন কলম, সৃজনশীল সাহিত্য সংকলণ, অক্টোবর, ১৯৯৭ সংখ্যা, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও লিখেছেন–"গোলাম রাব্বানী পুঁথি পড়ার আসর বসাতেন। বিয়ের উপহার পত্র লিখতেন,নীলকর বিরোধীদের কবিতা ও শ্লোগান লিখে দিতেন। তবু আমার মনে হয় আব্বার প্রতিভা ও পরিবেশ দাদীর কাছে থেকেই বেশী প্রভাবিত। একবার খাবার সময় দাদীকে বললাম–'ডাল খেলে নাযে'। দাদী বললেন, 'ডাল? ওখাবোন কাল।' বলালম, কাল তো আলিয়ে যাবে। দাদী বললেন 'যদি যায় আলায়ে দিবানে ফালায়ে'। আরও এক দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। আব্বাস উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে আব্বা সাতদিন ধরে গানের জলসা বসিয়ে ছিলেন। দেশ–বিদেশের মান্যগন্য গায়ক, শ্রোতা, সাধারণ মানুষের ভিড়ে বাড়িসহ সারা গ্রাম মুখরিত। প্রতিদিন গরু, ছাগল, মুরগী, পুকুরের মাছ, রাঁধা হত। খাওয়া–দাওয়া, গান, বাজনা, গল্প গুজবের সে যে কি আনন্দ মুখর পরিবেশ তা উপভোগ করা ছাড়া বর্ণনায় বলা সম্ভব নয়। তখণ আব্বাস চাচা গিয়েছেন দাদীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির মধ্যে। দাদী বললেন, 'কি দেখতে আসছো বাবা'। খোকা [আব্বার ডাক নাম] আমার সরোবরের পদ্মফুল– উপর থেকে দেখাই ভাল–বোঁটা বেয়ে গোড়ায় গেলে শুধু পাক [কাদা] পাবে'। চাচা মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন –'যে স্থান থেকে এ পদ্ম ফুলের উৎপত্তি সেই পাকস্থানকেই [পবিত্র] সালাম করতে এলাম।[১] উপরের বর্ননা থেকে বুঝা যায় যে, গোলাম মোস্তফার মাতাও ছিলেন স্বভাব কবি।

গোলাম মোস্তফা এই সুশিক্ষিত, স্বভাব কবি পরিবারের সদস্য ছিলেন বলেই এত কাব্যজ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ভাষাও সাহিত্যের চর্চা এই পরিবারের ঐতিহ্য ছিল। আর তাই গোলাম মোস্তফা চরিত্রে এত সব গুণের সমারোহ হয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর বংশের তালিকাটি অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হলঃ–

১. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বংশ তালিকা

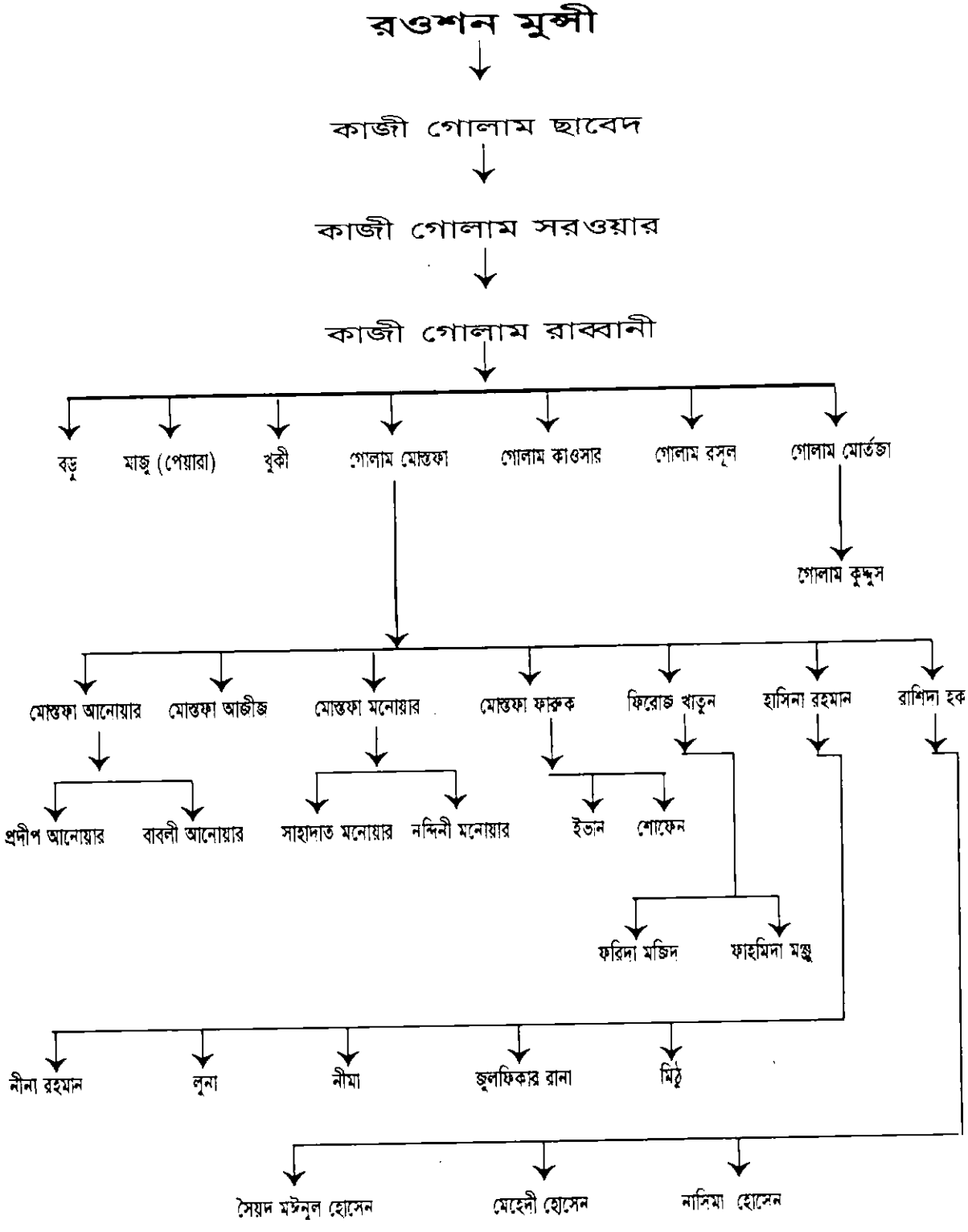

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার শৈশব ও কাব্যের উন্মেষ

গোলাম মোস্তফা'র পিতা, পিতামহ উভয়েই স্বভাব কবি ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন পরিবেশে এমন বিদ্বান লোক ছিল হাতে গোনা। আর গোলাম মোস্তফা'র শৈশব কাটে তাঁদের মত বড় মাপের ব্যক্তিত্বের স্নেহ ছায়ায়। তাঁদের ঐতিহ্য ও আদর্শে তিনি বেড়ে উঠেন, এছাড়াও কবির মাতা ও সন্তানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নারী চরিত্রের সবগুলি গুণ। তাই বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেসব গুণে ভূষিত হয়ে ছিলেন।

গোলাম মোস্তফা পারিবারিক পরিবেশে শৈশবকাল হতেই কাব্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেছেন যা কবির শিশু হৃদয়কে আলোড়িত করে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে–A man is known by the company he keeps. গোলাম মোস্তফার শৈশবে পিতার নিকট থেকে বিদ্যাসুন্দর, কাসাসুল আম্বিয়া পুঁথি, কিতাব ইত্যাদি আবৃত্তি শোনতেন বাড়ির দহলিজে সান্ধ্য আসরে। কবি দেখতেন তাঁর পিতা বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র দিন, তারিখ, মাস মিলিয়ে কবিতার আকারে তৈরী করতেন এবং কবিতা লিখতেন। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা যা গোলাম মোস্তফা'র পিতা কিনতেন ও পড়তেন, তা থেকে তিনি মাঝে মধ্যে পিতার আদেশে পাঠ করে শোনাতেন। ফলে কবির পত্রিকা পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠে শৈশবেই।[১]

শৈশব হতেই গোলাম মোস্তফার কাব্য–প্রীতি ছিল। কারণ শৈশবের পারিবারিক পরিবেশে তাঁর মনে কবিত্বের ছোঁয়া লাগে। ফলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে কবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। এই প্রসঙ্গে সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন লিখেছেন–"গোলাম মোস্তফার কবি প্রতিভার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তাঁর শৈশবকালেই পরিবারের আবহাওয়ায়। অনুকূল পরিবেশের জন্যই তাঁর হৃদয়ে কবিতার প্রতি অগাধ অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তাঁর সুপ্ত প্রতিভা অল্প কালের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে।"[২]

---

১. ডঃ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃ. ১৫

২. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (সম্পাদক), বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ৩৫ শরৎগুপ্ত রোড, বাংলা একাডেমী ১৯৮৫ইং, পৃ. ১৪৯৩

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা যে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন সেখানকার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসগির্ক শোভা গ্রামটিকে আরও মনোহর করেছে। মনোহরপুর গ্রামটি আসলেই মনোহর। শৈলকুপা শহর থেকে দু'মাইল দক্ষিণে মনোহরপুর গ্রাম। গ্রামটির পশ্চিমে 'কুমার নদী' পুর্ব দিকে দিয়ে সমান্তরাল ভাবে গেছে সদর রাস্তা। রাস্তার পূর্ব দিকেই আবার বিশাল মাঠ। মাঠে নানা ধরনের ফলস ফলে সবুজের সমারোহ থাকে প্রায় সারা বছরই। আর সেই গ্রামের প্রাকৃতিক শোভায় কবি শৈশব অতিবাহিত করেন।[১]

কবি স্বয়ং নিজ গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–"রাস্তায় দাঁড়িয়ে পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকালে দূরের কালো, কালো গ্রামগুলি পুঞ্জীভূত স্বপ্নের মত মনে হয়। ঐ মইষা ডাংগা, এ পাইক পাড়া, ঐ ধল্লা, ঐ কওড়া আর ও কত কি নাম, যুগ যুগ ধরে গ্রামগুলি একই জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন কি রহস্যের ছাপ ওখানকার তরু পল্লবে পুঞ্জীভুত হয়ে আছে। একবার ভাবি, কোন বিশ্বশিল্পী বড় বড় চিত্র এঁকে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে। আবার ভাবি নীলাম্বরী শাড়ী পরা কোন লাজুক বৃদ্ধা পল্লীবধূ ঘোমটা টেনে হয়তো ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। তার না দেখা যায় মুখ, না দেখা যায় পা, শুধু দেখা যায়, সবুজ শাড়ী আর জমিন ছোঁয়া কালো পাড়----------।"[২]

---

১. এ.কে.এম. মহিউদ্দিন, কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ইং, পৃ. ৩

২. আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, ছোটদের জীবনী গ্রন্থ (২২), বন্দে আলী মিয়া : কবি গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা–১৯৮৬, পৃ. ২১, কবি এই সম্পর্কে আরও লিখেছেন–"মাঠ আমাদের চমৎকার। ধান, পাট হয়, কলাই, মশুরী হয়। মেঘ–রোদ, আলো–বাতাস আর পানি নিয়ে সব সময় তার খেলা। এই মেঠো বুড়ির কান্ড কারখানা দেখলে অবাক হতে হয়। চিরদিন সে সোনার ফসল ফলায় অথচ তার দু'হাতে সবাইকে বিলিয়ে দেয়। মানুষ–গরু, পাখ–পাখলী সবাইকে সে খেতে দেয়, কাউকে বঞ্চিত করেন না। তার ভান্ডার চিরঅবারিত, আর ক্ষেত খামারের কোন বেড়া নেই, সীমা প্রাচীর নেই। যুক্তির কঠিন বন্ধনে তার চারি পাশ ঘেরা। বুড়ির এমন কড়া শাসন যে, সেই যুক্তির প্রাচীর পার হয়ে কোন চোর ডাকাতই তার সম্পদ লুঠ করতে আসে না। বুড়ি বেজায় হুশিয়ার। আদিকালের যখন গ্রাম, মাঠ, খাল–বিল, নদী–নালার মধ্যে জমাজমির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোল হলো। তখন বুড়ি একাই অনেক জায়গা দখল করে বসলো। দু'হাত দিয়ে গ্রামগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বললো ঃ দেখো, এই আমার সীমানা। এই সীমানার এ দিকে পা বাড়াবি তো, ঠেংগিয়ে জন্দ করবে। গ্রামগুলো ভয়ে জড়সড় হয়ে সরে দাঁড়াল। বুড়ির সংগে ঝগড়া করবে কে, সেই যে সরে দাঁড়াল তো দাঁড়ালই। গ্রামগুলো সেই থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ির জায়গা বেদখল করতে সাহস করে না। বুড়ি ও মরে না ওদের আশাও পূর্ণ হয় না। এমনি সুন্দর গ্রাম আমাদের"।(এ.কে.এম. মহিউদ্দিন, কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ইং, পৃ. ৪)

Dhaka University Institutional Repository

এই জন্যই কবি লিখতে পেরেছিলেন –

"এই মোর জন্মভূমি মনোহরপুর
যার স্নেহ মমতায় মনভরপুর
এমন আকাশ আলো মুক্ত চারিধার
এই মাটি এই তৃণ কোথায় পাব আর ?" [১]

গোলাম মোস্তফা শৈশব হতেই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী এই সম্পর্কে লিখেছেন–"শোনা যায় কবি শিশু কিশোরকাল থেকেই ছিলেন ভাবুক। বৃক্ষ–ছায়া–শীতল নদীর তীরে প্রায়ই একা বসে থাকতেন এবং কাব্য রচনা করতেন। তাঁর বহু শিশু কবিতা 'বনভোজন' ইত্যাদির নায়ক নায়িকাগণ এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিল।"[২] তাঁদের গ্রামের এই নয়নাভিরাম দৃশ্যই শিশু কবির মনে কবিত্বের ছোঁয়া লাগায়। ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল এর মতে, "এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশই ছিল– A meet nurse for a poetic child."[৩]

গোলাম মোস্তফার শৈশবে এই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নদীর তীরের সৌন্দর্য্য ভালবাসতেন। তাই পরিণত বয়সে কুমার নদীর তীরে তাঁর পিতার কিছু সম্পত্তি ছিল, সেখানে বাড়ী করার ইচ্ছা পরিবারের কাছে ব্যক্ত করেন। এই কথা জানতে পেরে, তাঁর সৎ মা ঐ জমিতে তাঁর কোন এক দূর সম্পর্কের ভাইপোকে বাড়ি করে থাকার অনুমতি দিলেন। এতে গোলাম মোস্তফা ব্যথিত চিত্তে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। আর তাই গ্রামবাসী সকলে মিলে ৭ বিঘা জমি তাঁকে দিলেন। তিনি স্বল্প আয়ের লোক ছিলেন তাই ধীরে ধীরে জমির মূল্য পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে কুমার নদীর তীরের সেই জমিটিতে তিনি বাড়ী তৈরী করেন। কুমার নদীর স্নিগ্ধ বাতাস কবির মনে কবিতার ভাব এনে দিত। তাই

---

১. এ.কে.এম. মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল–মে–জুন '৯৮ সংখ্যা, পৃ. ১০০
৩. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা , ই.ফা. বা. ১৯৯২ই, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি লিখেছিলেন –

"শারদ প্রভাত চাঁদনীর রাত সুপ্তি নীরব ধারা
আতট–পূরতি সরসী সলিল পদ্ম পানায় ভরা,
কলমি লতিকা ডাঁটায় ও পাতায় ছাইয়া ফেলেছেন জল,
মাঝে মাঝে তার নানান রঙের ফুটেছে পুষ্পদল।"[১]

প্রায়ই তিনি কুমার নদীতে নৌকায় চড়ে বেড়াতেন, সঙ্গে নিতেন হারমোনিয়াম। নদীর খোলা হাওয়ায় তিনি প্রাণ ভরে গাইতেন নজরুল গীতি বা রবীন্দ্র সংগীত।

বাল্যকালে তিনি যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি খেলাধুলা ও তাঁর উৎসাহ ছিল অনেক। খেলাধুলার মধ্যে তাঁর পছন্দ ছিল–গুলবাড়ী, কাবাডি, ঘুড়ি উড়ানো ও ফুটবল। ফুটবল খেলায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কবির বাল্য বন্ধু মোশাররফ হোসেন বর্ণনা করে যে তিনিই প্রথম তাঁদের গ্রামে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। গোলাম মোস্তফার চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ছোট বেলা থেকেই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার নিকট তিনি সামান্য বিষয়েও মিথ্যা বলতেন না। তিনি সে সময় গ্রামের সমবয়সীদের সাথে আড্ডা মারতেন। যা তাঁর পিতার অপছন্দনীয় ছিল। তাই খেলাধুলা ও আড্ডা মারার জন্য মাঝে মধ্যেই তাঁকে বেত্রাঘাত পেতে হত। সৎ মায়ের অবহেলা ও পিতার অসহনীয় বেত্রাঘাতের কারণে তিনি প্রায়ই তাঁর মাতুলালয়ে চলে যেতেন। আর সেখানেও তিনি বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা জমাতেন।বলা বহুল্য, মাতুলালয় থেকেই তাঁর অধিকাংশ আবদার পূরণ করা হত।[২]

---

১. 'সওগাত', অভিসার, ১৯৩২ইং (১৩২৫ বঙ্গাব্দ), পৌষ সংখ্যা

২. মোশাররফ হোসেন কবির বন্ধুছিলেন। কবির জেষ্ঠ্য কন্যা ফিরোজা খাতুনের কাছে চিঠির মাধ্যমে কবির শৈশবের স্মৃতি চারণ সম্পর্কে চিঠি লিখেছেন বর্ণনাটি তা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ও তাঁর গানের কণ্ঠ ছিল সুমধুর। সন্ধ্যা বেলায় ছোট ছোট ছেলের সাথে নিয়ে মাঠের মধ্যে গানের আসর জমাতেন। তাছাড়া পিতা যখন পুঁথি কেতাবের ছন্দময় আবৃত্তি করতেন তখন শিশু গোলাম মোস্তফা অভিভূত হতেন। কবির সেই ছেলে বেলার মধুময় দিনগুলো এবং পরিবারিক পরিবেশ কবির মনে কাব্যের রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিল। ডঃ খালেক মাসুকে রসুল এই সম্পর্কে লিখেছেন–"পিতার কণ্ঠে কবিতার সুমধুর আবৃত্তি শুনে শিশুর কণ্ঠে ফুটতো কল–কাকলি, প্রাণে জাগতো কবিতা লেখার দুর্বার বাসনা। সর্বোপরি একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ, নদীনালা বেষ্টিত শৈলকূপার নৈসর্গিক শোভা ও গ্রামের আবেষ্টনী কিশোর গোলাম মোস্তফার রোমান্টিক মানস প্রবণতা ও আবেগ–অনুভূতির জাগিয়ে তোলে। স্কুলের ছাত্র জীবনে কবিতার দক্ষিণ হাওয়া তাঁকে পাগল করে তোলে। কবিতা হয়ে পড়ে নিত্যদিনের সহচরী, যখন তখন কবিতা লিখে তিনি তাঁর মনের দিগন্ত প্রসারিত করার প্রয়াস পেতেন। তাঁর ভূবনে তখন ছন্দে রবি শশী ওঠে ও ছন্দে তারা অস্ত যায়।"[১] আর এভাবেই গোলাম মোস্তফার শৈশব কালের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রেরণাতে কাব্যের উন্মেষ ঘটে। স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই কবি কাব্য চর্চায় আত্ম নিয়োগ করেন। কবি স্বয়ং 'আমার জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন –"আমার বেশ মনে পড়ে,আমার কাব্য জীবনের প্রথম উন্মেষ হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। আমি তখন শৈলকুপা হাত স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।নীচের ক্লাশ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমি শৈলকুপা হাই স্কুলে পড়েছি। ৫ম শ্রেণীতে উঠবার পরই কেমন যেনো একটা কাব্যিকভাব আমার মধ্যে এলো।" [২]

১৯১১ সালে বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় তিনি তাঁর জনৈক ছাত্র–বন্ধুকে চিঠি লিখেন কবিতায়। তাঁর কবি জীবনের প্রথম পর্যায়ে রচিত অন্যতম সে কবিতায়। তিনি বন্ধুকে আবেগপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন –

---

১. ড. খালেক মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫–১৬

২. গোলাম মোস্তফা, প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনায় মাহফুজা খাতুন ১৯৬৮ইং, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

"এস, এস শীঘ্র এস ওহে ভ্রাতৃধন
শীতল করহ প্রাণ দিয়া দরশন
ছুটি ও ফুরাল
স্কুল ও খুলিল,
তবে আর এত দেরী কিসের কারণ।"[১]

উদ্ধৃত কবিতায় কবির পূর্ণতার স্বাক্ষর তেমন নেই, তথাপিও প্রতিশ্রুতির নিশ্চিত সম্ভাবনা লক্ষ্যনীয়। এতেই ছান্দসিক কবির ভবিষ্যত নৈপুণ্যের উন্মেষ দেখা যায়।[২] এরপর আর কবি থেমে থাকেননি। ১৯১৩ 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' শীর্ষক কবিতাটি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতার বিষয়বস্তু, ভাব, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গী সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম বাংলায় একজন শক্তিশালী কবির আবিস্কারের সচকিত হয়ে উঠে।[৩]

এই প্রসঙ্গে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন "পরিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং বন্ধুবর্গের প্রেরণায় গোলাম মোস্তফার অবরুদ্ধ কাব্য প্রবাহ ঝর্ণা প্রবাহের মত বাইরে প্রবেশ করল। সেই সময়ে ইউরোপ খন্ডে বলকান যুদ্ধ চলছিলো। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটা বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিলো। এমন সময়ে সহসা সংবাদ পাওয়া গেল কামাল পাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আদ্রিয়ানোপল' পুনরুদ্ধার করেছেন। এই খবরে স্বজাতি–বৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি " আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নাম দিয়ে একরাত্রির মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অতঃপর কবিতাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটির সূচনা ছিল এইরূপঃ

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ. ১৫
২. ডঃ খালেক মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩. ডঃ খালেক মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

"আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া
ধরায় আসিল নামিয়া"

কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশ–ভঙ্গী তখনকার দিনে সবই ছিলো নূতন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে এ–কথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন।"[১]তাঁর 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' কবিতা থেকে প্রমাণিত হয় যে হাই স্কুলে পাঠদ্দশাতেই তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তখনই তিনি প্রতিশ্রুতিশীল কবি হিসাবে চিহ্নিত হন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বাংলায় জনপ্রিয় কবি ছিলেন দু'জন। এঁরা হলেন শাহাদৎ হোসেন ও গোলাম মোস্তফা।[২]

১. বন্দে আলী মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩
২. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন

গোলাম মোস্তফা মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর পিতার নিকট শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। গোলাম মোস্তফার পিতা কাজী গোলাম রাব্বানী কর্তৃক নিজ বাড়িতে এবং পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামে স্থাপিত পাঠশালায় চার বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে সেই পাঠশালাতে গোলাম মোস্তফার বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় এবং তাঁর শৈশবও অতিবাহিত হয় গ্রামীন পরিবেশে। দামুকদিয়া গ্রামের পাঠশালাতে কিছুকাল বিদ্যা অর্জনের পর, গোলাম মোস্তফাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় নিকটবর্তী ফাজিলপুর গ্রামের পাঠশালাতে । সেখানে পাঠশালার দোর্দন্ড প্রতাপ পন্ডিত ত্রৈলক্ষ্যনাথ দত্তের[১] কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ন্যায় রাশভারী পন্ডিত সেকালে খুব কমই ছিল। এই পন্ডিত কবির জীবনের এক স্মৃতি বিজড়িত অধ্যায়।[২]

এর দু'বছর পর গোলাম মোস্তফাকে ১৯০৪ সালে ভর্তি করা হয় শৈলকূপা হাইস্কুলে। হিন্দু মুসলিম সবাই পড়ত সেই স্কুলে। স্কুলটি মনোহরপুর হতে দুই মাইল দূরে ছিল। এই বিষয়ে কবির জেষ্ঠ্য কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন – " ৫/৬ বছর বয়সে আব্বা শৈলকুপা হাই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ক্লাশের শুন্যস্থান পূরণের খাতায় আব্বা ঘরের জায়গায় ঘর, ফুলের জায়গায় ফুল এঁকেদিয়ে ছিলেন। মাস্টার সাহেব তাই দেখে আব্বার হাত ধরে দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে দাদাকে বললেন ছেলের প্রতি যত্ন নেন। এ ছেলে শুধু আপনার বা আমার নয় দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। হেড মাস্টার সাহেব হিন্দু ছিলেন কিন্তু একটা মুসলমান ছেলের জন্য তার চিন্তা কি সাম্প্রদায়িকতাহীন, উদার, কর্তব্যনিষ্ঠ, সততা ও মমতাপূর্ণ ছিল।"[৩]

---

১. পন্ডিত ত্রৈলক্ষ্যনাথ সে কালের খুব নামী পন্ডিত ছিলেন। এই পন্ডিতের পাঠশালার বৈশিষ্ট্য ছিল–তিনি ছাত্রদের বসতে দিতেন না। ছাত্ররা যার যার আসন বাড়ী হতে নিয়ে আসত [কবির জেষ্ঠ্য কন্যা ফিরোজা খাতুনের নিকট সংরক্ষিত কবি বন্ধু মোশারফ হোসেন লিখিত "গোলাম মোস্তফার শৈশব স্মৃতি" হতে সংগৃহীত।

২. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃ.১৩

৩. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বার সংখ্যা, ১৯৯৭ইং (১২ বর্ষ ১৭–১২ সংখ্যা) পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষাতে বরাবরই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ফলে স্কুল থেকে তিনি প্রতিবার পুরস্কার লাভ করতেন। একবার এক মজার কান্ড ঘটে। তখন তিনি থার্ড ক্লাশ অর্থাৎ বর্তমান অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সে বৎসর তিনি পুরস্কারের দিন শুনতে পান, এবার তিনি পুরস্কারটি পাবেন না। কারণ সে বছর তিনি প্রথম হওয়াতো দূরের কথা, অংকে তিনি মাত্র ৯ নম্বর পেয়েছেন।[১] ফলে তিনি ঐ বৎসর অন্যান্য সব পুরস্কার হতেই বঞ্চিত হলেন। এছাড়া তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে বরাবরই পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রতি বছরই তিনি ভাল ছাত্র, সদ্ব্যবহার, আবৃতি সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে পুরস্কার পেতেন। কবির ছেলে বেলা স্বাচ্ছন্দে কাটেনি।তিনি অনেক দুঃখ কষ্টে ভরা প্রতিকুল পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন –" তাঁর জ্ঞান পিপাসিত প্রতিভার তরীকে উজান পথে অনেক ঝড় ঝাপটার মুকাবিলা করে বয়ে নিতে হয়েছে লক্ষ্য স্থলে। শৈশবকালেই সৎ মা থাকায় স্বভাবতই বাপের অবহেলায় কখনো মামার বাড়ি কখনও নিজের বাড়িতে থাকতে হতো। আর্থিক অনটনে শৈশবেই টিউশনি করতে হতো। তারপরও ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়েছেন।"[২]

কবি কন্যা আর ও বলেছেন–" আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফার হাতের লেখার মত তাঁর ভাষাও অতি সুন্দর ও মিষ্টি স্বাচ্ছন্দ গতি একটুও বাধে না কোথাও । শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯১৪ সালে শৈলকুপা ইংরেজী হাইস্কুলে থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে আই, এ পাস করেন খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজ হতে। এর পর তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বঙ্গ দেশের রাজধানী কলিকাতা যান। সেখানে কলিকাতার রিপন কলেজ হতে ১৯১৮ সালে বি,এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় থাকাকালীন তখনকার যুগের বহু জ্ঞানীগুনী প্রতিভাবান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। আর্থিক দৈন্যতার কারণে পরবর্তীতে তিনি কর্মজীবনের প্রবেশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯২২ সালে তিনি বি,টি, ডিগ্রী লাভ করেন।[৩]

---

১. আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, ছোটদের জীবনী গ্রন্থ (২২), বন্দে আলী মিয়া, কবি গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬ইং পৃ. ২০

২. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৩. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা যখন পড়াশোনা করতেন তখন মুসলিমগনের পড়াশোনা খুব কম ঘরেই ছিল। বর্তমান যুগে এটা যত সহজ সাধ্য ব্যাপার আজ থেকে সত্তর/আশি বছর আগে তা মোটেই সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল না। অজস্র হিন্দু ছাত্রের মধ্যে তিনি মুসলিম ছাত্র যেন হংস মাঝে বক।তখন হিন্দু সংস্কৃতির চাপে স্বধর্মীর সংস্কৃতির কথা ভাবা যেতো না। তিনি ছেলেবেলা থেকেই বিজাতীয় সংস্কৃতি অপছন্দ করতেন। ইসলামী রীতি–নীতি ও চাল চলনে অভ্যস্ত ছিলেন। সেকালে মুসলিম ছাত্ররা ও স্কুল–কলেজে ধুতি পরতো, ,কিন্তু তিনি যদিও দাড়ি রাখেননি তবুও পোশাকে তাঁর মুসলমানিত্বের দিকটি ফুটে উঠত।[১] কবি জীবনের কখনোই পোশাকের চাকচিক্য প্রাধান্য দিতেন না বরং এ সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলতেন–

" অঙ্গে যাদের ত্রুটি আছে, ভূষণ শুধু তারাই পরে
তারাই শুধু ভূষণ দিয়ে সুশ্রী হতে চেষ্টা করে
যাদের সে দোষ নাইকো মোটে –
আপন শোভায় আপনি ফোটে,
বলো দিকিন তারা আবার পরবে ভূষণ কিসের তরে?
অঙ্গে কভূ ভূষণ –শোভা দেবো নাকো তোমায় প্রিয়ে,
নিজেই যে জন ভূষণ তারে কি ফল পুনঃ ভূষণ দিয়ে !
ভূষণ নিজে পরার চেয়ে
সুখ যে বেশী ভূষণ হয়ে !
ভূষণ হয়ে শোভা করো আমার দেহ আমার হিয়ে ! "[২]

১. আব্দুল কাদির (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
২. গোলাম মোস্তফা ঃ রক্তরাগ, কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), আব্দুল কাদির সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১ ইং, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বৈবাহিক জীবন

গোলাম মোস্তফা মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বিয়ের পূর্বে কবির পিতার সাথে শ্বশুরের এই মর্মে চুক্তি হয় যে– বি,এ, পড়ার যাবতীয় খরচ কবির শ্বশুর বহন করবেন। চুক্তির কথা জেনে তিনি তার বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি কখনোই অন্যের দান বা করুণা গ্রহণ করতে চাইতেন না পরবর্তীতে শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে সে মতই গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শ্বশুরের নিকট থেকে তিনি পিতৃস্নেহ পেয়েছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালে যশোহর জেলার মাগুড়া মহকুমার শ্রীপুর থানার নাকোল গ্রামের নিকবর্তী কমলাপুর গ্রামে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী নাম জমিলা খাতুন। তিনি রাবেয়া খাতুন ও ডাঃ এলাম হোসেনের প্রথমা কন্যা ছিলেন। ডাঃ এলাম হোসেন তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কলকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতাল হতে ডাক্তারী পাশ করেন। পেশাগত ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনি ইংরেজী,ফারসি, সংস্কৃত সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।১ তিনি অনেক সৌখিন লোক ছিলেন। তখন কার দিনে তিনি ঘোড়ার চড়ে রুগী দেখতে যেতেন, তাঁর সাথে থাকত এলসেশিয়ান কুকুর। ৩/৪ সন্তান জন্মানো পর্যন্ত গোলাম মোস্তফার স্ত্রী তাঁর বাবার বাড়ীতেই থাকতেন।

গোলাম মোস্তফা'র স্ত্রী জমিলা খাতুন প্রতিভা সম্পন্ন গুণী মহিলা ছিলেন। তখনকার দিনে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিলেন। কুরআন–হাদীসেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অসামান্য। পিতার সাহচার্যে এবং নিজের চেষ্টা সাধনায় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি রক্ষণশীলা মহিলা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যখনই কোন মুমূর্ষু রোগীর খবর পেতেন তখনই হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে চলে যেতেন রোগীর সেবায়।২ কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন এই

---

১. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক),ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং ([১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা], পৃ. ৯৯

২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক) প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল –মে–জুন'৯৮ সংখ্যা, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে লিখেছেন–"দাদীর আসরে তিনি কুরআন, হাদীস, বইপুস্তক ও খবরের কাগজ থেকে পরে শোনাতেন–খাদ্য ও পথ্যের গুণাগুণ এবং রান্নার কথা বলতেন। কুশলাদি জেনে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করতেন–পর্দানশীন হয়েও মুমূর্ষু রোগীর খবর পেলেই হোমিওপ্যাথির বাক্স সাথে ছুটে যেতেন। উদার নৈতিক স্বভাবজাত ব্যবহারে গ্রামের নারী সমাজ তাঁর গুণাবলীতে প্রভাবান্বিত হত। রেডিও, ক্যাসেট, ভিডিও এবং সিনেমাবিহীন তখনকার অজগ্রামে এসবের যে খুব প্রয়োজন ছিল–তা আজ লিখতে বসে উপলব্ধি করতে পারছি।"[১]

গোলাম মোস্তফা অতিথি আপ্যায়ন করতে ভালবাসতেন আর জমিলা খাতুন জানতেন রুচিশীল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার রান্না করতে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহিনী ও পরোপকারী। জীবনের শেষদিকে তিনি শিরঃপীড়ায় ভূগেছেন অনেকদিন।[২] শিরঃপীড়া শুরু হলে নিজেই হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়েছেন। একদিন তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান এবং ১৪ দিন পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে বললেন–তিনি মেনেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যখন ১৪ দিন অজ্ঞান ছিলেন তখন অনবরত মাথায় আইসব্যাগ দিয়ে রাখার কারণে 'নিউমোনিয়া' হয়ে যায়। এরপর ১৯৩৮ সালের ১লা অক্টোবর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৭ মাসের শিশু কন্যা ঝর্ণা সহ ৭ জন সন্তান–সন্ততি রেখে যান।[৩]

এই বিষয়ে কবি কন্যা আবেগাপ্লুতভাবে বর্ণনা দেন যে,–"রাত্রি ১১টার সময় মা আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমার হঠাৎ যেন মনে পড়লো মা একটা ঢাকাই শাড়ী সযত্নে তুলে রাখতো কোথাও যাবার সময় পরার জন্য। মার কোথাও যাওয়া হত না। চট করে মার বাক্স খুলে সেই শাড়ি বের করে 'মা!

১. মতিউর রহমান মল্লিক (সম্পাদক), নতুন কলম, সুজনশীল সাহিত্য সংকলন, অক্টোবর, ১৯৯৭ সংখ্যা, পৃ. ২০

২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৩. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক)–, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

এই শাড়ী যে তুমি কোথাও যাবার সময় পরার জন্য রেখেছো না পরেই চলে যাচ্ছো।' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই শাড়ী দিয়ে মাকে ঢেকে দিলাম।[১]

জমিলা খাতুনের মৃত্যুতে সংসারের জটিলতা বেড়েই চলছিল কারণ ৭ (সাত) মাসের ছোট্ট শিশু ঝর্না এবং ছোট ছেলে মন্টুও তখন খুব ছোট। বড় কন্যা ফিরোজা খাতুনের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ল তাঁর কাঁধে। ছোট ভাই–বোনদের স্কুলে পাঠানো, সংসারের ঝামেলা সামলানো ফিরোজা খাতুনের পক্ষে দুস্কর হয়ে উঠল। অতঃপর সকলে গোলাম মোস্তফাকে বুঝিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করলেন। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আবার বিয়ে করেন। এই বিষয়ে ফিরোজা খাতুন লিখেছেন যে– "আমার বড় ভাই মোস্তফা আনোয়ার বম্বে থেকে এলেন। বাপ যেমন ছেলেকে বিয়ে দেয়, ভাই তেমিন বাপের বাপ হয়ে আব্বাকে বিয়ে দিলেন। সঙ্গে করে আসানসোল গেলেন। আগের ট্রেনে ফিরে এসে গিনি কিনে দাদির হাতে দিলেন, আমাদের হাতে ফুলের মালা দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে গেলেন। ফুলের মালা পরিয়ে আমরা বাপ–মাকে আনলাম। মা দাদিকে সালাম করলে দাদি গিনিটা দিলেন। পরদিন সকালে ভাই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে মার হাতে সংসারের চাবিটা দেওয়ালেন। আর মন্টুকে (মোস্তফা মনোয়ার) মার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন–আর কাউকে আপনার দেখতে হবে না। শুধু মন্টুকে আপনি দেখে রাখবেন। মন্টু যেন হারাধন খুঁজে পেলো। মায়ের গলা জড়িয়ে বুকের সাথে মিশে রইলো। কি অপরূপ দৃশ্য! কিন্তু ভাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো। আমার ও ভাইবোনের দায়িত্ব বাড়লো।"[২]

১. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

২. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

মাহফুজা খাতুন ও শিক্ষিতা ছিলেন।তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত আসান সোলের একটি স্কুলে পড়াশোনা করেন। পারিপার্শ্বিক কারণে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেননি। গোলাম মোস্তফার সাথে যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। বিয়ের পর তিনিও সুস্বাদু খাদ্য রান্না করতে শিখেছিলেন। মাহফুজা খাতুনের গর্ভে প্রথম সন্তান মোস্তফা ফারুক পাশা জন্ম নেয়। এরপর আর একটি সন্তান ভুমিষ্ট হয়ে মারা যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে মাহফুজা খাতুন মাসিক নওবাহার [১৯৪৮] পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় গোলাম মোস্তফা লিখিত কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। তিনি মাঝে মধ্যে গল্প, প্রবন্ধও লিখতেন যা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। ফরিদপুরে গোলাম মোস্তফা একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন করেছিলেন এর সাথে মাহফুজা খাতুন জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে মাহফুজা খাতুন ইহজগত ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বংশধর

গোলাম মোস্তফা প্রথমা স্ত্রী জমিলা খাতুন–এর গর্ভে নয় সন্তানের জন্ম হয়। জমিলা খাতুনের মৃত্যুর পুর্বে তাঁর দুই ছেলে আমীরুল কাদির ও ঝন্টুর মৃত্যুর হয়। জমিলা খাতুনের মৃত্যুর পর ৪ বছরের কন্যা ঝর্ণার মৃত্যু হয়। গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দু'টি সন্তান জন্ম নেয়। প্রথম সন্তান মোস্তফা ফারুক পাশা, এখনও জীবিত আছেন আর দ্বিতীয় সন্তানটি মারা যায়। নিম্নে গোলাম মোস্তফার সন্তান–সন্ততিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল

মোস্তফা আনোয়ার (১৯১৮-১৯৫৯)

গোলাম মোস্তফার প্রথম সন্তান ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ২৫শে জুলাই।তিনি কলিকাতা হেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন। তিনি একজন আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ বৈমানিক ছিলেন এবং ভাল গান গাইতেন। মোস্তফা আনোয়ার পেশাধারী শিক্ষা মার্চেন্ট নেভীর ট্রেনিং জাহাজ 'ড্রাফিন' থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩৮ সালে মার্চেন্ট নেভীতে যোগ দেন।[১] ট্রেনিং এর সময় তার ব্যবহারে কর্তৃপক্ষ মুগ্ধ ছিল। এই সময় তিনি নজরুল ইসলাম–এর গান " চল্ চল্ চল্" এর তালে তালে মার্চ করার প্রচলন করেছিলেন, ট্রেনিং–এ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি 'ভাইস রয়েস গোল্ড মেডেল' পান। দু'বছর পর তিনি IAF–এ Pilot হিসেবে যোগ দেন।[২]

ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার ১৯৪৫ সালে কাউকে না জানিয়ে "মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র লেখক নিখিল নাথ রায়ের পুত্র ত্রিদিপনাথ রায়ের প্রথম কন্যা সুস্মিতা রায়কে বিয়ে করেন। এই পরিবারিটির সঙ্গে ১৯৪৪ সালে

১. এ. জামান, যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার (প্রথম খন্ড), প্রকাশক–এ.বি.এম. আশরাফউজ্জামান, লতিফ মঞ্জিল, নওয়াপাড়া রোড, ঘোপ, যশোর, ১৯৯৮ইং পৃ. ১৭৮

২. খন্দার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল মে–জুন সংখ্যা ১৯৯৮ইং পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

মোস্তফা আনোয়ারের মাধ্যমে গোলাম মোস্তফার পরিবারের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। পরিবারটি যদিও হিন্দু ছিল তথাপি তাদের আধুনিক কৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গোলাম মোস্তফা সুস্মিতা রায় (ডাক নাম 'রেখা') কে অটোগ্রাফসহ একটি কবিতা লিখে দেন। এই কবিতাটিতে কবি সুস্মিতা রায়ের দাদা, বাবা ও মা'র নামের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত মিল রেখেছেন। কবিতাটি ছিল–

" কল্যাণীয়া শ্রীমতি রেখা রায়কে"

রেখা!
নিখিলের তুমি চির পিতা
চির চেনা – চির দেখা॥
ত্রিদিপ কুমারী ছিলে অলকায়
চোখে তব সেই জ্যোতি ঝলকায়
মানবী হইয়া ধূলার ধরায়
ফিরিতেছ একা একা॥
কণ্ঠ বীণায় বাজিতেছে তোমার
কত বিচিত্র সুর
আকাশের সীমা পেরিয়ে সে সুর
ভেসে যায় বহুদূর
স্নেহ মমতায় ওগো রূপ ছবি
আশীষ জানায় তোমারে এ –কবি–
মিটুক তোমার মনের পাতায়
যত সাধ আছে লেখা॥" ১

দীর্ঘ ১৪ বছর মোস্তফা আনোয়ার ভারতীয় Civil Eviation এর পাইলট হিসেবে কাজ করেন। এই সময় তিনি ইংরেজী ভাষায় তথ্যমূলক গ্রন্থ "Civil Eviation in India" (১৯৪৫ ডিসেম্বর) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত কয়েকটি রচনার পান্ডুলিপি রয়েছে। এর মধ্যে

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য হল "সাগর ও আকাশ"। মোস্তফা আনোয়ার ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানের Senior Most Pilot হিসেবে Pakistan International Air Lines এ যোগ দেন। তিনি সব সময় বলতেন– " যদি আমি মারা যাই তবে আমার ভুলের জন্য মরব না।" আর তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। একজন জুনিয়র পাইলটের ভুলের কারণে ১৯৫৯ সালের ১৪ই আগষ্ট " মিষ্ট্রি অব ঢাকা' নামক বিমানটিতে আগুন ধরে গেলে মোস্তফা আনোয়ার প্রাণ হারান।[১]

ব্যক্তিগত জীবনে মোস্তফা আনোয়ার খুব মিশুক ছিলেন। তাঁর ব্যবহার মাধুর্যে সকলেই বিমোহিত ছিল। তিনি দেখতে অনেকটা তার পিতার মতই ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি দুই সন্তান রেখে যান। তাঁর ছেলে প্রদীপ আনোয়ার মার্চেন্ট নেভীতে ক্যাপ্টেন আর মেয়ে মনীষা আনোয়ার এম এ পাস করে বর্তমানে গৃহিণী।

মোস্তফা আনোয়ারের মৃত্যুতে কবি পরিবারের শোকের ছায়া নেমে আসে। গোলাম মোস্তফা পুত্র শোকে বিহবল হয়ে পড়লেন। আনোয়ার স্মরণে তিনি একটি কবিতা লিখেন।

" আনোয়ার স্মরণে –

– গোলাম মোস্তফা

(১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৯ করাচী বিমান বন্দরে " ডাইকাউন্ট' দুর্ঘনায় আমার জৈষ্ঠ্যপুত্র ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ারের শোচনীয় মৃত্যুতে –)

" নিস্তব্ধ রাত্রির শেষে পশ্চিম দিগন্তে
অকস্মাৎ শুনিলাম হাহাকার ধ্বণি।
কোথা যেন ভয়ংকার ভুমিকম্পে–অগ্নি লাভা স্রাবে
হারায়েছে দেশ তার কি যেন কি অপূর্ব সম্পদ।
সে কান্নার প্রতিধ্বণি শুনিলাম দূরে –
আকাশে বাতাসে গ্রহে তারায়–তারায়
সমস্ত প্রকৃতি আজ বিষাদ মলিন।" ২

[দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ]

---

১. এ. জামান, প্রাগুক, পৃ.১৭৯

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

মোস্তফা আজিজ (১৯২১-১৯৯৫)

কবির দ্বিতীয় পুত্র মোস্তফা আজিজের জন্ম ১৯২১ সালে। তিনি কলিকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাস করেন।পেন্সিল স্কেচে ছিল তাঁর বিরল দক্ষতা । তিনি দুই / তিন মিনিটের মধ্যে যে কোন প্রতিকৃতি দৃশ্য এঁকে দিতে পারতেন। মনের মত বিষয় হলেই তিনি তা এঁকে নিতেন। গরীবের স্কেচ যদি করতেন তবে তাঁকে পয়সা দিয়ে বলতেন " তোমার থালার চেয়ে আমার পকেট কম। তুব তুমি নাও, আমার জুটে যাবে। কাজী মোতাহার হোসেন ছিল তাঁর 'দাবাগুরু"। রাতের পর রাত দাবা খেলতেন এবং ফজরের আগে সাইকেলে করে পৌছে দিতেন। তিনি হস্তরেখা বিশারদও ছিলেন। তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন এবং সব সময় কিছুনা কিছু তাঁদের জন্য পকেটে রাখতেন। ছাত্র জীবনে তিনি স্কাউট ছিলেন এবং খেলাধুলায় ও পারদর্শী ছিলেন।[১]

দৈনিক ঠিকানার বিশেষ সংখ্যায় নজমুল আলম মল্লিকের "যার পেন্সিলের আঁচরে গণমানুষের অভিব্যক্তি ফোঁটে" নামক নিবন্ধে মোস্তফা আজিজ সম্পর্কে মন্তব্য করেন– "পূর্ব দেশের কাজের মুখ, বাংলার বাণীর বাংলার মুখ, ইত্তেফাকের বেলা–অবেলার মুখ, সংবাদের যন্ত্রনার মুখ, আজাদের বন্ধুত্বের মুখ, দৈনিক বার্তার চেনা মুখ, সাপ্তাহিক পূর্বাণীর গুণী মুখ, গণকণ্ঠের গণমুখ, সাপ্তাহিক বিপ্লবের বিপ্লবী খেলোয়াড়ের মুখ। ষান্মাসিক ক্রীড়াজগতে ক্রীড়া জগতের মুখ, দৈনিক বাংলার চিবিত্র মুখ, দৈনিক দেশের শিশু মুখ, জনতায় জনতার মুখ, সচিত্র বাংলাদেশে কাজের বিচিত্র মুখ, মর্নিং নিউজে যারা ম্যাডোনা সিরিজ দেখেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ছবিগুলো নির্মাতা যেমন প্রতিভাধর তেমনি জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে শিল্পীর রয়েছে গভীর উপলব্ধি। প্রখর উপলব্ধি তথা পেন্সিল স্কেচের ক্ষেত্রে একজন অধিপতি অর্থাৎ অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর এই শিল্পী মোস্তফা আজিজ এমনিভাবে আয়নায় মুখ রেখে নিজের ছবিটি ও এঁকেছেন। তিনি গভীর

১. মতিউর রহমান মল্লিক (সম্পাদক), নতুন কলম, সৃজনশীল সাহিত্য সংকলন, অক্টোবর '৯৭ সংখ্যা, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

অন্ত:দৃষ্টি দিয়ে নিজের চেহারা তীক্ষ্ণভাবে স্ট্যাডি করে শিল্পী মোস্তফা আজিজের আঁকা নিজের পেন্সিল স্কেচটি কেবল বাইরের অবয়বই প্রতিফলিত হয়নি বরং ফুটে উঠেছে সাধারণ চিত্রের বাইরের এক ব্যক্তিত্ব।[১] শেষ জীবনে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ছবি এঁকেছেন ও সবার সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। তিনি ১৯৯৫ সালে মারা যান।

মোস্তফা মনোয়ার (জন্ম-১৯৩৫)

কবির তৃতীয় পুত্র মোস্তফা মনোয়ারের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। তিনিও একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্র শিল্পী। তিনি কলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে ফাইন আর্টস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি সাহিত্য, গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি সকল বিষয়েই পারদর্শী। মোস্তফা মনোয়ার টেলিভিশন, শিল্পকলা একাডেমী ও চলচিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রাক্তন মহাপরিচারক ছিলেন। '৫২-র ভাষা আন্দোলন চলাকালীন নাজিমুদ্দিনের ভূড়ির উপর দিকে "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" পোস্টার লিখে দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিলেন। ফলশ্রুতিতে দুই মাস জেল খেটেছেন। একবার মোস্তফা মনোয়ারের একটি প্রোগ্রাম টেলিভিশনে দেখে সৈয়দ আলী আহসান ও আবদুল হাই সাহেব বলেন-এত চমৎকার করে উপস্থাপনা করতে অন্য আর্টিষ্টরা পারতেন না। কবি সাহেবের ছেলে বলেই সম্ভব হয়েছে।[২] ১৯৯৩-এর সার্ক সম্মেলনের মিশুকের স্থপতি মোস্তফা মনোয়ার । এটি তার আর্টের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বর্তমানে তিনি- Educational puppet Development center,ধানমন্ডিতে পাপেট শিল্পের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এদেশে তিনিই প্রথম পাপেট ও এনিমেশন-এর প্রচলন ঘটান।[৩]

---

১. আবুল হোসেন মীর (সম্পাদক), দৈনিক ঠিকানা, বিশেষ সংখ্যা, ৭ম বর্ষ সংখ্যা, ১৯৮৪ইং দ্রষ্টব্য।

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৩. এ জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মোস্তফা ফারুক পাশা (জন্ম-১৯৩৯)

মোস্তফা ফারুক পাশার জন্ম ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৯। তিনি কবির দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র পুত্র। তিনি লন্ডন থেকে ফার্ষ্ট ক্লাশ পিয়ানো বাদক হয়ে এসেছেন।

ফিরোজা খাতুন (জন্ম - ১৯২৫)

কবির প্রথমা কন্যা ফিরোজা খাতুন ১৯২৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একধারে লিখিকা, সমাজসেবিকা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন। তিনি খুববেশী পড়াশোনা করেননি। তাঁর স্বামী মহবিল মজিদ তড়িৎ প্রকৌশল ও পুরকলা বিশেষজ্ঞ। পান্ডিত্য ও সৃজন পটুতায় তিনি কীর্তিমান ছিলেন। ফিরোজা খাতুনের প্রথম লেখা "ব্যবধান" গল্পটি ছাপা হয় ১৯৫৬ সালে " অনন্য পত্রিকায় অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন লেখিকা লায়লা সামাদ। এরপর তিনি আরো দু'টি গল্প লিখেন যা অনন্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্প দু'টি হলো–"নেকলেস (১৯৫৬)","কাজের স্বামী" (১৯৫৮)।"[১]

ফিরোজা খাতুন ১৯৬৮ সালে গোলাম মোস্তফার গানের বই 'গীতি সঞ্চয়ন, এর সম্পাদনা করেন যার প্রচ্ছদ অংকন করেন মোস্তফা মনোয়ার। এছাড়াও ১৯৬৬ সালে "কবি গোলাম মোস্তফা" নামক গ্রন্থটি, যা বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়, বইটির সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন।[২]

ফিরোজা খাতুন যে সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত সেগুলো হল ––।(১) আপোয়া, সদস্য, (২) মহিলা ফেডারেশন, সহসভাপতি, (৩) মহিলা পরিষদ, সদস্য, (৪) সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, সহ–সভাপতি, (৫) কেন্দ্রিক মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা, সহ–সভাপতি, (৬).

১. এ. জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

২. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ ইং দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬ আজীবন সদস্য, (৭) নজরুল একাডেমী, আজীবন সদস্য (৮) যশোর সমিতি, সহ-সম্পাদক, (৯) ঝিনাইদহ জেলা সমিতি, সহ-সম্পাদক, (১০) ঝিনাইদহের চিঠি, উপদেষ্টা, (১১) শৈবাল নাট্যচক্র, উপদেষ্টা, (১২) চক্রবাক, উপদেষ্টা, (১৩) কবি গোলাম মোস্তফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনোহরপুর, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, (১৪) মনি মুকুর শিশু বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ১৯৭৭, (১৫) হিন্দোল সঙ্গীত একাডেমী, প্রতিষ্ঠাতা, সভানেত্রী, (১৬) গোলাম মোস্তফা শিক্ষালয়, প্রতিষ্ঠাতা, সভানেত্রী (১৭) কবি গোলাম মোস্তফা ট্রাস্ট , প্রেসিডেন্ট, (১৮) সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ,'দীপশিখা' কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৯) কবি গোলাম মোস্তফা, জন্ম শত বর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি, ভাইস প্রেসিডেন্ট।[১] ফিরোজা খাতুন লিখেছেন-" আমি একটা গানের বইও সম্পাদনা করেছি, সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের উপদেশ ও সাহায্যে। এর জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর এর জন্য পুরস্কার পেয়েছি ড. শহীদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে। তাঁকে যখন বইটা উপহার দিলাম, তিনি বললেন- 'তুমিই প্রথম বাপের জন্য বই করলে--বাপের উপযুক্ত মেয়ে তুমি-তোমার নাম দিলাম সুজাতা-তোমার আব্বার দেয়া নামের সাথে আমার নাম যুক্ত হল সুজাতা জোছনা।"[২]

ফিরোজা খাতুনের বড় মেয়ে ফরিদা মজিদ আমেরিকার নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটি'র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। তিনি বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। তিনি একাধারে কবি, ভাষাবিদ এবং অনুবাদক। বাংলাদেশের কয়েকজন কবির কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে এবং মৌলিক রচনার মধ্যদিয়ে সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর অনুবাদ ও ইংরেজী ভাষায়

১. এ জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আট। তিনি সম্প্রতি মূল আরবী থেকে কুরআনের বঙ্গানুবাদ শুরু করেছেন। তিনি ১৯৮১ সালে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে এওয়ার্ড পেয়েছেন।[১]

ফিরোজা খাতুনের দ্বিতীয় মেয়ে ফাহমিদা মজিদ মঞ্জু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান (ক্লিনিক্যাল)-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বিদেশ থেকে তিনি Child Psychology-তে Diploma করেছেন। শিশুদের জন্য "ছড়ানো ছড়া" গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন (১৯৬৫)। স্বরচিত কিছু কবিতা এবং প্রবন্ধ বিভিন্ন বাংলা এবং ইংরেজী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। আর এম.এ.সাইকোনিউরোসিস এবং অসামাজিক অর্থনীতি গবেষণামূলক প্রতিবেদন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের বাৎসরিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর চিত্রকর্মের "আল্পনা" এবং 'ফটোগ্রাফী' বেশ কিছু জার্নাল ও পোস্টারে ছাপা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বেশ কিছু পাঠ্য পুস্তক এবং সাহিত্য সাময়িকীর প্রচ্ছদ এঁকেছেন।[২]

হাসিনা রহমান (১৯২৭ - ১৯৮৫)

কবির দ্বিতীয় কন্যা হাসিনা রহমান ওরফে হাসনা (১৯২৭-১৯৮৫)। তিনি একজন সুগৃহিণী ও সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। তাঁর স্বামী লুৎফর রহমান একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাঁর বড় মেয়ে নীলুফার ফারুক (নীলা) সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর ছোট মেয়ে নিমা রহমান একাধারে টিভি ও মঞ্চের অভিনেত্রী এবং প্রথম শ্রেণীর আবৃত্তিকার।[৩]

রশিদা হক (জন্ম-১৯৩০)

কবির তৃতীয় ও কনিষ্ঠ কন্যা রশিদা হক (১৯৩০)। তিনি ও গৃহিণী। রশিদা হক প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ এমদাদুল হক-এর পুত্রবধূ। রাশিদা হকের বড় ছেলে সৈয়দ মঈনুল হোসেন 'জাতীয় স্মৃতি সৌধ'-এর স্থপতি এবং এর জন্য দুই লক্ষ টাকা পুরস্কারও পান।[৪]

---

১. মতিউর রহমান মল্লিক (সম্পাদক), নতুন কলম, সৃজনশীল সাহিত্য সংকলন, অক্টোবর ১৯৯৭ সংখ্যা, পৃ. ২২

২. এ. জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৩. মতিউর রহমান মল্লিক (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশন, ১৯৯৮ইং পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

জীবনের শেষ দিনগুলো গোলাম মোস্তফা খুবই অসহায় অবস্থায় কাটান। অক্ষমতার নিরানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাঁর সব কিছুই। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় প্রায়ই শয্যায় কাটাতেন। বন্ধু–বান্ধব, অতিথি এলে আগের মতন অতিথেয়তা করতে পারতেন না। ড্রয়িং রুমে এসে প্রানোচ্ছল সেই দিনগুলোর মত আড্ডা দিতে কিংবা শখের পিয়ানোতে প্রিয় কোন গান গাইতে পারতেন না। মৃত্যুর তিন–চার মাস পূর্বে হঠাৎ পায়ে থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিনি কিছুদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। এরপর মাস খানেক মেডিকেলে থাকার পর যখন কিছুটা সুস্থ হলেন তখন তাঁকে বাসায় আনা হল। তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো শারীরিকভাবে অসুস্থতার মধ্যদিয়েই কাটান। শারীরিকভাবে যদিও তিনি অক্ষম ছিলেন, তথাপিও মনের জোরে তিনি শ্রুতলিপির মাধ্যমে শেষ লেখা সমাপ্ত করার মানসে সাধনা করেছেন। কোন আপত্তিকে তিনি মেনে নেননি। ১৯৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর তিনি শেষ লেখার কাজ সমাপ্ত করেন রাত প্রায় দশটায়। সেদিনই রাত ১২টার দিকে হঠাৎ করে আবার থ্রম্বসিসে রোগে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারান। পরদিন বিকেলে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করানো হলো। তিনি পক্ষাঘাত গ্রস্থও হলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে খাবার ও শ্বাস–প্রশ্বাসের কাজ চালানো হয়। হাসপাতালের ডাক্তারদের চেষ্টা সাধনার পর ও তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হলো না। ১৯৬৪ সালের ১৩ই অক্টোবর রাত ১১টায় তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁকে আজিমপুরস্থ গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার ইমামতি করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ্ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছেন –"গোলাম মোস্তফা আমার ছোট ভাইয়ের ন্যায় ছিলেন। আমার হর্ষ–বিষাদের সুযোগ ঘটেছিল যখন তাঁর জানাযায় আমি এমামতি করেছি এবং তাঁর দাফনে আমি শরীক হয়েছি।[১] এভাবেই কবির ইহজীবনের

১. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), কবি গোলাম মোস্তফা আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৬৮ ইং পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্তি ঘটে। যদিও রবীন্দ্র নাথের মত তিনিও এই সুন্দর পৃথিবীকে ভালবেসে ছেড়ে যেতে চাননি। তাই কবি লিখেছেন–

"আমার যাবার পর হয়তো তখন
করিবে সবাই আমি অশ্রু বরিষন
বসাইকে শোক –সভা, বিরচিবে গান
উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বাণী দিবে দান।
কী ফল ফলিবে তাহে। সেই শোক –গাঁথা
সে ক্রন্দন, সে উচ্ছ্বাস, সে বিরহ–ব্যথা,
মোর কাছে পৌছিবে না; কবর প্রাচীর
দূর্লঙ্ঘ্য পবর্তসম তুলি উচ্চ শির
আড়াল করিয়া রবে এপার–ওপার
বন্ধ হবে চিরতরে খেয়া পারাপার।
শুনিবে না কারো কথা কেহই তখন,
কবরের দুই তীরে বসি দুই জন
কাঁদিব আপন মনে । সব অশ্রুজল
অরন্যেরোদন সম হইবে নিষ্ফল।"[১]

[মৃত্যু – উৎসব]

অপর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন –

"সকলই ছাড়িয়া যাবো ? এ জগত পড়ে রবে পিছু ?
আর আমি দু'নয়নে এ বিশ্বের হেরিব না কিছু ?
মরণ কি টেনে দেবে আঁখি কোণে অন্ধ আবরণ ?
এপার –ওপার মাঝে রবে না কোন স্মৃতির বন্ধন ?
হে বিরাট ! তব পাশে আজি মোর এই নিবেদন
প্রভূ, তুমি কৃপা করি ইচ্ছা মোর করিও পূরণ–
মরণের পরপারে যেই বেশে যেই দেশে যাই,
তোমার আকাশ–আলো তুব যেন দেখিবারে পাই!
নিখিলের এই শোভা, এই হাসি, এই রূপরাশি,
মরিয়াও আমি যেন প্রাণ দিয়ে সবে ভালোবাসি।"[২]

[পরপারের কামনা]

১. গোলাম মোস্তফা, কাব্য সংকলন, সম্পাদনায় সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস, ঢাকা, পৃ. ৫৩–৫৪
২. গোলাম মোস্তফা, রক্তরাগ,কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), আব্দুল কাদির সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা–১৯৭১ইং, পৃ. ৫৯–৬০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম জীবন

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম জীবন

গোলাম মোস্তফা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সে সময় যে কোন মুসলিম গ্রাজুয়েটের জন্য শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করা খুবই কঠিন ছিল। যদিও দু'এক জন এ পেশা গ্রহণ করতেন তথাপি তাঁদের পক্ষে স্বজাতীয় ও স্বধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তিনি কর্মজীবনে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ছাত্রদের তিনি আদর্শবান করার জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন। কারণ কবির মতে –

"শিক্ষক মোরা শিক্ষক
মানুষের মোরা পরমাত্মীয়
ধরণীর মোরা দীক্ষক
পিতা গড়ে শিশুর শরীর
মোরা গড়ি তার মন
পিতা বড় কিবা শিক্ষক বড়
বলিবে সে কোন জন।

আমারা তাদের কোলে তুলে নেই হাসি মুখে ভালবেসে
নূতন জন্ম লাভ যেন তারা নূতন জগতে এসে।"[১]

সেযুগে গোলাম মোস্তফা নিজ প্রতিভাগুণে প্রমাণ করেছিলেন যে, মুসলমানগণও ভালো শিক্ষক হতে পারে। তাঁর রচিত বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক গুলি বাংলার ছাত্র সমাজে তাঁর পরিচিত এনে দিয়েছিল। "শিক্ষক হিসেবে তিনি শুধু নিজের জীবিকার্জন করেননি, আমাদের শিক্ষার হেরফের সম্বন্ধে ও খোজঁ খবর নিয়েছেন।বাংলার মুসলমান তখন আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নবাগত। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানের চেয়ে অনেকবেশী অগ্রসর ছিল হিন্দু সমাজ। স্কুল–কলেজে

১. গোলাম মোস্তফা, বুলবুলিস্তান, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী
প্রথম সংস্করন –১৯৪৯ইং, পৃ. ২৪৫.

Dhaka University Institutional Repository

তারা শিক্ষকতা করতেন, দুর্ভাগ্য উপযুক্ত মুসলমানদের তুলনায় তারা ছিলেন অত্যাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ।স্কুল–কলেজের মুসলমান শিক্ষক বা মুসলিম ছাত্রের আনাগোনা ছিল নিতান্ত সীমিত। হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্রগণ মুসলিম ছাত্রের আনাগোনা কৃপার দৃষ্টিতে দেখতেন। আচার–আচারণ, পোশাক–আশাকে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা হিন্দুদের অনুকরণ করত।

পায়জামা–পাঞ্জাবী ছাত্রদের মধ্যে প্রচলনের সাহস ছিল না।মুসলমান ছাত্র শিক্ষক হিন্দু তোষণের প্রয়োজনে সবাই ধূতি পরতেন। জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে ছিল এক প্রকার হীনমন্যতা। ব্যক্তিগত জীবনে গোলাম মোস্তফা ছিলেন নিজস্ব ঐতিহ্য–সচেতন এবং মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় ভাব ও ঐতিহ্য চেতনা জাগ্রত করতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন।"[১]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Berak Pur Government High School। এর শিক্ষক হিসেবে তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি David Hear Traning College থেকে B.T ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর হতেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যখন তাঁর কোন লেখা ছাপা হত তখন গোলাম মোস্তফা B.A.B.T. ছাপা হত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গোলাম মোস্তফা পারিবারিক 'কাজী' উপাধি নামের সাথে যুক্ত করতে অপছন্দ করতেন। ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল এসম্পর্কে লিখেছেন–"কবি গোলাম মোস্তফাকে এইরূপ উপাধি লজ্জা প্রদান করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁর কোনো পূর্ব–পুরুষ স্মরণাতীতকালে এক সময় কাজী ছিলেন বলে তিনি নিজে কাজী না হয়েও পূর্ব–পুরুষের সুবাদে নিজেকে কাজী বলে জাহির করতে পারেন না।"[২]

গোলাম মোস্তফা ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে Berak Pur Government High School থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় Hear School এ আসেন। ঐতিহ্যবাহী Hear School এ দীর্ঘ নয় বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি বদলী হন কলকাতা

১. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ই.ফা. বা, ১৯৯২ ইং, পৃ. ২৩– ২৪

২. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায়। অতঃ পর "১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম মোস্তফা Baligonj Government Demonstration High School - এ যোগ দান করেন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন"।[১] কলকাতার কোন Government High School এ তিনি ছিলেন প্রথম মুসলমান হেডমাষ্টার। বৃটিশ শাসনের শেষ দিকে যে কয়জন এই সৌভাগ্য অর্জন করেন গোলাম মোস্তফা তাদের অন্যতম। উল্লেখ্য, ইসলামী রেঁনেসার কবি ফররুখ আহমদ উক্ত স্কুলে কবির ছাত্র ছিলেন।

Baligonj Govt. Demonstration High School. হতে বদলী হয়ে গোলাম মোস্তফা Hugli Collegiat School. এ যান। অতঃপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বদলী হয়ে যান বাঁকুড়া জেলা স্কুলে। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল হল ফরিদপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সেখানে তিনি বিভাগপূর্ব ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে বদলী হয়ে যান। জীবনের দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি অতিবাহিত করেন হাইস্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক হিসাবে।সরকারী স্কুলে চাকুরী করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। পাকিস্তান আন্দোলন ও কায়েদে আজমের আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। নব গঠিতপাকিস্তান রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গড়ার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরীর বিধি অনুযায়ী তিনি আরও তিন/চার বছর চাকুরী করতে পারতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কাব্য রচনা ও সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[২] এত বদলী, এত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তাঁর কাব্য সাধনায় ব্যাঘাত ঘটেনি। স্কুলের শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের পড়ানোর সাথে সাথে চালিয়েছেন সাহিত্য সাধনা।

তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কারণ তাঁর জানা ছিল– "ইংরেজী প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেরাণী তৈরী করা চলে কিন্তু

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ইং, পৃ. ১৭

২. ড. আনোয়ার মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ তৈরী করা যায় না। তিনি এ পরম সত্যটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতেন। এদেশের মানুষ বইয়ের ভাড়ে উদ্বুদ্ধ হয়, নিজের অন্তরের সত্যকে সযত্নে চাপা দিয়ে রাখে। এর কারণ, শিক্ষা ব্যবহার দীর্ঘ দিনের গলদ।"[১] বুক কমিটির সদস্যগণ যে সকল বইকে পাঠ্য পুস্তকের মর্যাদা দিয়েছিল; তা মুসলিম বা হিন্দু কোন জাতিরই সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হত না।তৎকালীন সংখ্যাগুরু মুসলিম সমাজের প্রকৃত কোন রূপই পাঠ্য–পুস্তকে প্রতিফলিত হত না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত পাঠ্য বইয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'শাতিল আরব' কবিতাটি স্থান দিয়েছিল। এ কবিতাটিতে আছে।

"শাতিল আরব, শাতিল আরব, পুত যুগে যুগে তোমার তরী,
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।

শহীদের দেন, বিদায়,
এ আভাগা আজ নোয়ায় শির।"[২]

" বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপরিচিত 'শহীদ' শব্দটির অর্থ জানাতে গিয়ে ফুটনোট লিখেছিলেনঃ শহীদ এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী যারা দাড়ি গোফ ও চোখের ভ্রু কামিয়ে ফেলে। হিন্দু শিক্ষকেরা পাঠ্য পুস্তকে কোন মুসলমানী শব্দ দেখলে নাক সিটকাতেন, অনেক সময় তাঁরা সে শব্দের আজগুবি অর্থ করতেন। ব্রিটিশ আমলের সেই বিসদৃশ্য পরিবেশে গোলাম মোস্তফা সরকারী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষক হিসেবে পারদর্শীতা প্রদর্শন করেছেন।"[৩]

১৯২০–১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে একটানা স্বার্থক জীবন শেষে অবসর গ্রহণের পর গোলাম মোস্তফা শান্তিনগরের নিজস্ব বাসভবন

---

১. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২. কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, মাওলা ব্রাদার্স ১৯৯৫ ইং, পৃ. ৫৫
৩. ড.খালেদ মাসুকে রসুল , প্রাগুক্ত পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

"মোস্তফা মঞ্জিল" এ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তখনকার সময়ে শান্তিনগর এলাকাটি কবি, সাহিত্যিকদের প্রিয় স্থান ছিল। এর কারণে হয়ত ছিল সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পরিবেশ।

গোলাম মোস্তফা পেশাগত জীবন থেকে অবসর গ্রহণকালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রাদেশিক সদস্য পদে অধিষ্ঠিত হন।[১] তদানীন্তন পূর্ববাংলার সরকার কর্তৃক গঠিত "ভাষা সংস্কার কমিটি" (১৯৪৮) সম্পাদক রূপে যোগ দেন।[২] "তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো এবং আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন এবং টেক্স্ট বুক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এছাড়া করাচীস্থ বুলবুল একাডেমী, কেন্দ্রীয় বঙ্গভাষা সম্প্রসারণ বোর্ড ও উহার কার্যকরী সংসদ ও পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন।"[৩]

"১৯৪১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বাংলা সরকারী স্কুলের শিক্ষক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন ।"[৪] তিনি পাকিস্তান লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন । এছাড়া তিনি রাজশাহী ডিভিশন এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রাদেশিক টেক্স্ট বুক কমিটি মনোনীত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঃ তিনি কয়েকটি কয়েকটি পাঠ্য–পুস্তক রচনা করেন । এছাড়া তিনি বেশ কয়েক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

"ইকবাল একাডেমী কাউন্সিল করাচীর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন গোলাম মোস্তফা। The Central Board for development of Bengali (Dhaka). National Book center of pakistan (Dhaka). Islamic Academy (Dhaka). Urdu-Bengali development Board (Lahore) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি The National Bureau of

১. ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, মে ১৯৬৫ইং পাকিস্তান পাবলিকেশন, পৃ. ৩২৭

২. কবি গোলাম মোস্তফা, সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ফিরোজা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৬৭ইং, পৃ. ৭৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৪. খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, প্রেক্ষণ, এপ্রিল –জুন – ৯৮, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

National Reconstruction এর সদস্য ছিলেন।"[১] গোলাম মোস্তফা "১৯৬০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ১৯৬১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানী লেখক বৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।"[২] তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি ঢাকা, পাকিস্তান মজলিস, রওনক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তিনি নওবাহার [১৯৪৮] পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন। বংগীয় মুসলামান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র " সাহিত্য"(১৯২৭)-এর সম্পাদনা করতেন যৌথভাবে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাথে।[৩] ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে Writers Guild এর মুখপত্র 'পূরবী' প্রকাশিত হয়। এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা ও আবদুল হাই। এক সংখ্যা পূরবীর আত্ম প্রকাশের পর গোলাম মোস্তফার সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয় Pakistan Writers Guild এর মুখপত্র 'লেখক সংঘ' পত্রিকা।

"১৯৪৫ খৃস্টাব্দে গোলাম মোস্তফা ঢাকায় "মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার মির্জাপুরের ও মহীউদ্দীন আহমদ এর যৌথ উদ্যোগে উক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে থেকেই মাসিক 'নওবাহার' প্রকাশিত হয়। এবং পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন মহীউদ্দীন আহমদ। সেখানে 'মুসলিম বেঙ্গল প্রেস' নামে একটি প্রেস ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রেস থেকেই মাসিক নওবাহার এবং গোলাম মোস্তফা রচিত অনেক বই মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হত।"[৪]

মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, মুসলিম বেঙ্গল প্রেস, মাসিক নওবাহার এগুলি বেশী দিন স্থায়ী ছিল না। মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী উঠিয়ে নিয়ে আজিমপুর গভর্ণমেন্ট নিউ মার্কেটে "Cordova library" নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে 'বাংলা সাহিত্য' নামে পাঠ্য-পুস্তকও সংকলন করেন।

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, প্রেক্ষণ, এপ্রিল-জুন-৯৮, সংখ্যা, পৃ. ১৫৩
২. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ১৩৩
৩. উদ্ধৃত, প্রেক্ষণ, পৃ. ২১৮
৪. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব

বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে যে ক'জন বাঙগালি মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইমলাম ও গোলাম মোস্তফার নাম উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এই দু'জন মহান কবির মধ্যে এক পর্যায়ে আদর্শিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল এবং তা নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের সাথে গোলাম মোস্তাফার প্রথম পরিচয় হয় কলিকাতায়। এ সম্পর্কে গোলাম মোস্তফা নিজে লিখেছেন–"কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে আমার পরিচয় ঘটে। ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে তখন ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিস।সেখানে প্রায়ই যেতাম। হঠাৎ একদিন শুনি নজরুল ইসলাম এসেছেন। এক মুহূর্তেই পরিচয় ঘটে গেল। তরুন কবির প্রানের প্রাচুর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করলো। তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতের যুগ। দেখলাম নজরুল খুব ভালো গান ও গাইতে পারেন। রবীন্দ্র নাথের বিখ্যাত গান ''আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি''– নজরুলের মুখেই প্রথম আমি শুনি। চমৎকার লাগলো, আমি তার কাছ থেকেই এ গানটি শিখেছিলাম। আর একটি জিনিস তার থেকে শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে স্বরলিপি থেকে হারমোনিয়ামে গান তোলা, নজরুল রবীন্দ্র সঙ্গীতেরই অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।"[১]

নজরুল ও গোলাম মোস্তফার সম্পর্ক সম্বন্ধে বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন–"১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে গোলাম মোস্তফার প্রথমা স্ত্রী কলিকাতায় ইনতিকাল করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন বর্ধমান জেলার আসানসোল নিবাসী সৈয়দ নূরুল আবসার সাহেবের কন্যাকে। বিবাহ সম্পর্কে তার নানা শ্বশুর। তিনি নূরুল আবসার সাহেবের স্ত্রীর চাচা। গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা কাজী সাহেবে গানের নিকট থেকে নজরুলের বাল্যজীবন সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি বাল্য কালে আব্দুল ওয়াহেদের যে রুটির দোকানে ময়দা মাখাতেন সেই দোকানও মোস্তফা সাহেব নিজে দেখে আসলেন।"[২]

---

১. গোলাম মোস্তফা ঃ প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনায় মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, পৃ. ১৩১

২. আবদুস সাত্তার (সম্পাদিত), ছোটদের জীবনী গ্রন্থ (২২), আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৬ ইং, পৃ. ৩৪–৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলামের সাথে গোলাম মোস্তফার পরিচয় ছিল এই বিয়ের পূর্ব হতেই। এই সময় নজরুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চমৎকারূপে বিশ্লেষণ করে গোলাম মোস্তফা একাট ছড়া রচনা করে ছিলেন। ছড়াটি তখন কার সময়ে বাংলা সাহিত্যে একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন–

"কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম
ভায়া গান গায় দিন রাত
হেসে লাফ দেয় তিন হাত।
প্রাণে হর্ষের ঢেউ বয়
ধরার পর তার কেউ নয়।"[১]

এই কবিতাটি পড়িয়া নজরুল ইসলাম রহস্য করিয়া গোলাম মোস্তফাকে বলেছিলেন – 'গোলাম মোস্তফা,
দিলাম ইস্তফা'।[২]

কবি গোলাম মোস্তফা মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁকে দিয়ে মাওলানা সাহেব বিরুদ্ধাচারীর দলপতির কাজ করাতেন। কবি গোলাম মোস্তফার এই ভূমিকা দেখে নজরুলকেও কলম ধরতে হয়, তার সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য। তিনি কবি গোলাম মোস্তফার লেখা "গর্ভবতী" কবিতার প্যারোডি লিখলেন "গর্ভবান" নাম দিয়ে। এবং এটি সাপ্তাহিক সওগাতে ছাপা হয়।[৩] গোলাম মোস্তফার "গর্ভবতী" কবিতাটি ছিল–

"গর্ভবতী"

গোলাম মোস্তফা বি–এ, বি–টি
ওগো সতী ওগো গর্ভবতী।
সরম–সঙ্কোচে কেন চকিত চরণে
আঁচল আড়াল দিয়া চলিয়াছ সান্তপর্নে?

১. প্রবাসী, ভাদ্র সংখ্যা – ১৩৩১ বঙ্গাব্দ
২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল মে– জুন, ৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৪৫
৩. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা– ১৯৮৫ ইং. পৃ. ৭১৯

Dhaka University Institutional Repository

গর্ভ ? সেত গর্ব্ব তব!
সে তোমার নারী–জীবনের
পরিপূর্ণ সার্থকথা। বিশ্ব–ভুবনের
দিকে দিকে চলিয়াছে সৃজনের যে রহস্য–লীলা
ওগো পুণ্যশীলা!
তুমি তাহা আপনার অন্তরের তলে
অনুভব করিতেছ নিশিদিন প্রতি পলে পলে
নিখিল প্রকৃতি–রাণী, ফুল পুষ্পে ভুবন ভরিয়া
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে; কবে কোথা কেমন করিয়া
কার মাঝে হইতেছে অকস্মাৎ ভ্রূণের সঞ্চার
সে রহস্য রহিয়াছে চিরদিন অজ্ঞাত সবার।"[১]

আর নজরুল লিখিত "গর্ভ বান" এর কয়েকটি ছত্র হল–

"একি ফান
ওগো গর্ভবান
নরম ও কৌচে কেন চকিতে বয়ানে
চাপকান চাপান দিয়া রহিয়াছে বিকচ্ছ শয়ানে।
*
ও কি গর্ভ
ও ত গর্ব্ব তব----------
*
মহামুদী খানায় হলো তব কাব্য গর্ভধান?
* এ রহস্য সৃজিল কি আক্রমিয়া মিয়া এডিটর?"[২] (এইড–ইটার)

করটিয়া থেকে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এই কবিতাটি সম্পর্কে সম্পাদক নাসির উদ্দিন সাহেবকে লিখেছেন "সম্পাদক সাহেব,------বড় অশ্লীল হয়ে গেল না কি ?"[৩] এসম্পর্কে নাসির উদ্দিন সাহেব লিখেছেন –"নজরুল ও তাঁর সঙ্গীরা গোপনে পরামর্শ করেই এটি প্রেসে দিয়েছিলেন। ছাপার পর লেখাটা আমার নজরে পড়লো কিন্তু তাঁরা হেসেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন।"[৪]

১. গোলাম মোস্তফা, বুলবুলিস্তান, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী ৪৫. মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ৯৫, ইসলামপুর ঢাকা প্রথম সংস্করণ ১৯৪৯, পৃ. ২৭০
২. মোহম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৯
৩. মোহম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০
৪. মোহম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে নজরুল সাহিত্যকে বঞ্চিত, অবাঞ্চিত এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন।[১] নজরুল কর্তৃক বিভিন্ন কাব্যে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি বিরোধি কতিপয় বাক্য ব্যবহার হয়েছে। গোলাম মোস্তফা যেহেতু ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির সেবক ছিলেন তাই তিনি এই বিষয়গুলো সুনজরে দেখতে পারেননি। গোলাম মোস্তফা এই সম্পর্কে লিখেছেন–নজরুলের সঙ্গে ছিল আমার আদর্শগত যা একটু পার্থক্য; কিন্তু তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর।[২]

"নজরুল কাব্যে অবাঞ্ছিত অংশ" প্রকাশিত হবার পর নজরুল ইসলাম সাপ্তাহিক সওগাতের 'চানাচুর' গোলাম মোস্তফার কবিতার কয়েকবার বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা করেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২০শে বৈশাখ তারিখে 'সাপ্তাহিক সওগাতে' কবি গোলাম মোস্তফার একটি কবিতা সম্পর্কে চানাচুর বিভাগে নজরুল ইসলাম লিখেছেন– "গোলাম মোস্তফা সাহেব রবীন্দ্র নাথের "মানস সুন্দরী" গেলার বদহজমীর ফলে (নর্ম্ম বধূ নয়) 'মর্ম্ম বধু' শীর্ষক একটা কবিতা প্রসব করেছিলেন। যে স্বপ্ন–সুন্দরীকে বিশ্বের সকল কবিই বাহু বন্ধনে পাবার জন্যে বৃথা আরাধনা করে গেছেন, দেখুন–কবি গোলাম মোস্তফার হাতে তার কি উপযুক্ত শাস্তি।

'প্রকৃতির ও গো দুষ্ট মেয়ে।
দিনে দিনে ভালবেসে তুমি মোরে করিছ দান।
এই ধরণীর বুকে একে একে সহস্র সন্তান।
তাদের প্রসূতি তুমি, তারা মোদের খাঁটি বংশধর।'

বেচারা প্রকৃতি দুলালীকেও তিনি পরশ না দিয়ে ছাড়লেন না।"[৩]

---

১. ড. খালেদ মাসুকে রাসূল মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃ. ৫১

২. গোলাম মোস্তফা : প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনা মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ ইং, পৃ. ১৩২

৩. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (সম্পাদিত), সাপ্তাহিক সওগাত, ২০শে বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা নজরুল বিরোধী ছিলেন না, তা'ছাড়া তিনি তাঁকে ছোট করার জন্য "নজরুল কাব্যে অবাঞ্ছিত অংশ" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন নি। তিনি তাঁর কাঙ্খিত প্রাণাধিক প্রিয় শিশু পাকিস্তান রাষ্ট্রের কল্যান কামনা করতে গিয়ে অমঙ্গল আশংকায় বিদ্রোহী কবির কিছু লেখা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।[১]" নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যাশ্রয়ী লেখাগুলোর আকুণ্ঠ ভক্ত ছিলেন গোলাম মোস্তফা।[২] সমকালীন ও পূর্ববর্তী বাংলার অমর কবিদের ও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। এঁদের কাব্যধারা তাঁকে অনেকটা অনেকক্ষেনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি কাব্যদর্শন নিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর আদর্শগত বিরোধ ছিল।[৩]

এছাড়া নজরুল ইসলামের অনেক কবিতায় 'পুরাণ' ও 'মীথ'–এর নানা অনুষঙ্গ সংযুক্ত হওয়ায় কবি গোলাম মোস্তফা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এছাড়া নজরুলের শ্যামা সংগীতও অন্যধর্মের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে রচিত হওয়ায় আদর্শবাদী মুসলিম কৃষ্টি ও স্বতন্ত্র জীবন চেতনায়স্থিত গোলাম মোস্তফার সঙ্গে নজরুলের ব্যবধান দূরতর হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।[৪] ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' ও ২২শে পৌষ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক বিজলী' তে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হবার পর মূলত তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গান কে স্বাগত জানালেও, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য বিরোধী কোন লেখা কেই তাই গোলাম মোস্তফা পছন্দ করেননি। যে কারনে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতিবাদে, ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'সওগাতে'–এ গোলাম মোস্তফা 'নিয়ন্ত্রিত' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করলেন।[৫]

---

১. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ইং, পৃ. ১০২
২. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বর, ৯৭ সংখ্যা, (১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা) পৃ.
৩. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃ. ৫০
৪. অধ্যাপক হাসান, আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক) প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৫. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'নিয়ন্ত্রিত' কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার প্রতিবাদ করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি মুক্তক মাত্রা বৃত্ত– ছন্দে লিখা। গোলাম মোস্তফার একই ছন্দে রচনা করেন 'নিয়ন্ত্রিত' কবিতা।'নিয়ন্ত্রিত' কবিতায় গোলাম মোস্তফা লিখেছেন–

ওগো 'বীর'

"সংযত করো সংহত করো 'উন্নত' তব শির।

"বিদ্রোহী"?–– শুনে হাসি পায়।

বাঁধন কারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ যায়?

সেকি সাজেরে পাগল সাজে তোর?

আপনার পায়ে দাঁড়াবার মতো কতোটুকু তোর আছে জোর ?"[১]

এই কবিতার শেষ স্তবকে প্রিয় কবির প্রতি মমতা মাখা সুরে তিনি লিখেছেন–

"ওগো বিদ্রোহী বীর–সৈন্য,

হবি কিসের জন্য বিদ্রোহী তবে, কিসের অভাব দৈন্য ?

তুই ধন্য, ওরে ধন্য,

তুই সৃষ্টির সেরা মানুষ শিশু–নহিস তুচ্ছ অন্য–

তুই ধন্য, ওরে ধন্য!

ওগো বিদ্রোহী মহাবীর,

তবে সংযত করো, সংহত করো,

উন্নত তব শির।"[২]

---

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা:কাব্য গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড),আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭১ ইং, পৃ. ৪৯

২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলর বিদ্রোহী কবিতায় আছে –

"বল বীর–

বল উন্নত মম শির,

শির, নেহারি, আমারি নত–শির ওই শিখর হিমাদ্রির।

বল বীর–

বল মহাবিশ্বের মহাকাল ফাড়ি,

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি,

ভূলোক দ্যূলোক গোলক ভেদিয়া,

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির–বিস্ময় আমি বিশ্ব–বিধাত্রীর।

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ–রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

বল বীর–

আমি চির–উন্নত শির।"[১]

'বিদ্রোহী' শাস্ত্র শাসিত, প্রতিকারহীন ক্ষমতার নির্মম নিপীড়নের শিকার অসহায় মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জিত অভিমানের অসহায় আর্তনাদ সৃষ্টির আদিকাল হতে এ আর্তনাদ মানবাত্মার কণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। নজরুল সেই মুক আর্তনাদকে তাঁর অপূর্ব লিপি কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর 'বিদ্রোহী' বিশ্ব–সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। গোলাম মোস্তফার ধর্মভীরু মন মানসিকতার সৃষ্টি 'নিয়ন্ত্রিত' সেই শাশ্বত মানবাত্মার দুর্বার অভিযানকে হজম করতে পারেনি, তাতে ধ্বনিত হয়েছে শংকাতুর মানবাত্মার ভীরু দুর্বল সুর। এ দুর্বল সুর ক্ষণস্থায়ী। কাজেই 'নিয়ন্ত্রিত'আজ ইতিহাসের অন্তর্গত।[২]

১. কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা–১৯৭২, পৃ. ৯

২. ড. খালেদ মাসুকে রসুল,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা এই সম্পর্কে লিখেছেন–

"এই কবিতা থেকেই সৃষ্টি হলো নজরুলের সাথে আমার একটা আদর্শগত বিভেদ। কবিতার অপূর্ব ছন্দ, শব্দ–সম্পদ, বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করলো, কিন্তু ওর অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে কেন যেন আমার মন সায় দিল না। দর্শন ও তত্ত্বকথার দিক দিয়ে আমি ছিলাম, সুফী কবি জালাল উদ্দীন রুমী, হাফিজ, রবীন্দ্র নাথ ও ইকবালের ভাবশিষ্য। মাওলানা রুমী যে বলেছেনঃ ''বাঁশী কি বলে শোনো, ঝাড় থেকে কে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এলো, এই কথাই তার বুক থেকে ধ্বণিত হচ্ছে'', অথবা রবীন্দ্র নাথ যে বলেছেনঃ "হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজ হে"–এই সুরেই আমার মনের বাণী ছিল বাঁধা। কাজেই খোদার আসন আরশ ভেদ করে উঠবার মতো বিদ্রোহ আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি লিখলাম ঠিক এর বিপরীত একটা কবিতা "নিয়ন্ত্রিত"। নজরুলে'র "বিদ্রোহী" কবিতা প্রকাশের পর মুসলিম সমাজের অনেকেই চঞ্চল, হয়ে ওঠেন; অনেক সাময়িক পত্রিকা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে গালাগালি দেয়। নজরুল তখন জেলে। জেলে বসেই তিনি সেই কবিতা ও মন্তব্য পাঠ করেন। আমার "নিয়ন্ত্রিত" কবিতা পড়ে তিনি তাঁর কোনো কোনো বন্ধুর কাছে এই মন্তব্য করেছিলেন– "আর সব্বাই দিয়েছে গালাগালি, গোলাম মোস্তফা দিয়েছে উত্তর।"[১]

গোলাম মোস্তফা এই সম্পর্কে আরো লিখেছেন– "নজরুলের সঙ্গে ছিল আমার আদর্শগত যা একটু পার্থক্য; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর। সর্বত্রই আমাদের দেখা শোনা ও মেলামেশা হয়েছে। আদর্শগত পার্থক্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখেও কেমন করে দুই কবি বন্ধু মিলতে পারে, আমরা তার সুন্দর নজীর। দুঃখের বিষয় এই মনোভাব আজকের কবি–সাহিত্যিকদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল"।[২]

১. মাহ্‌ফুজা খাতুন (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা ঃ প্রবন্ধ সংকলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ইং পৃ. ১৩১–১৩২

২. মাহ্‌ফুজা খাতুন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও কলিকাতা গ্রমোফোন ক্লাব ছিল, কণ্ঠ–শিল্পী, সুর শিল্পী এবং কবিদের মিলন কেন্দ্র। এই স্থানে গোলাম মোস্তফা ও আব্বাস উদ্দীন প্রায়ই কাজী নজরুল ইসলামের সহিত সাক্ষাত এবং মেলা মেশা করতেন এবং এই তিন জনই ওস্তাদ জমির উদ্দীন খানের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতেন।[১]

বস্তুত: গোলাম মোস্তফা নজরুল বিরোধী ছিলেন না, তাছাড়া তিনি তাঁকে ছোট করার জন্য কোন কিছু লিখতেন না।[২]

১. আবদুস সাত্তার (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২. আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর অতীত দিনেরস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন–'সে সময়ে 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক সাধারণ সভায় পঠিত হয়। তা নিয়ে মুসলমান সাহিত্যিক মহলে বেশ একটুখানি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কবি গোলাম মোস্তফা আমার প্রবন্ধের প্রতবিাদে 'সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার প্রবন্ধটি সেবারের (১৩৩৪) বার্ষিক ' সওগাত' এ প্রকাশিত হয়েছিল। গোলাম মোস্তফা সাহেবের প্রবন্ধটি কিছুদিন পরে ' মাসিক মোহাম্মদী'তে (আষাঢ়) ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। (অতীত দিনের স্মৃতি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃ. ১০৩.)

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী আন্দোলন ও গোলাম মোস্তফা

গোলাম মোস্তফা ছিলেন আপাদমস্তক পাকিস্তানী। তিনি পাকিস্তানী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন লেখনির মাধ্যমে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বাঙালি মুসলমানগণের সকলেই এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে পাকিস্তান স্বাধীন করেছিলেন। উল্লেখ যোগ্য প্রায় সকল কবি সাহিত্যিকই সেদিন স্বত:স্ফূর্তভাবে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র প্রশংসায় কলম ধরেছিলেন। আজকের দিনের জনপ্রিয় কবি সুফিয়া কামালও এ থেকে বাদ যান না। তবে এক্ষেত্রে কবি গোলাম মোস্তফার ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য। পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকেই পাকিস্তানের পক্ষে লেখালেখি ও কাজ শুরু করেছিলেন এবং আমৃত্যু (১৯৬৪ সাল পর্যন্ত) তা অব্যাহত ছিল। তিনি পাকিস্তানের ক্ষতি হোক এমন সামান্য সমালোচনামূলক কথাকেও পর্যন্ত বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না।[১]

বামপন্থী প্রগতিবাদীগণ 'নজরুল কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ' শীর্ষক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে গোলাম মোস্তফাকে কাজী নজরুল ইসলাম বিরোধী বলে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে এবং কবিকে বিতর্কিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে।[২] সে সময়ে গোলাম মোস্তফা নিজে কি চিন্তা করেছিলেন ও তাঁর সম্বন্ধে সমালোচকগণ কি ভাবছিলেন তা সাঈদ-উর-রাহমান রচিত "পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা" গ্রন্থের কিছু অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন-"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনায় গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। ১৯৪৭সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে ঢাকা রেডিও থেকে কোরআন তেলাওয়াতের পর গীত হয় গোলাম মোস্তফা রচিত সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা। দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান। পাকিস্তান সে পাকিস্তান।" (আব্বাস উদ্দীন আহমেদ, ১৯৬৫ঃ ১২৭) দু-এক বছরের মধ্যে

১. নাসির হেলাল, জাতীয় কাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ইং পৃ. ১০১-১০২

২. নাসির হেলাল , প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলে পূর্ব পাকিস্তনীদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখা ও বৃদ্ধি করার জন্য সীমান্ত সংলগ্ন শহরে শহরে গাওয়া হত কবি রচিত 'ওরে মোমিন ভাই তুই করিস কেন ভয়/পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে হবে হবে জয়' এবং আল্লা আল্লা করে ভাই যত মোমিনগণ। পাকিস্তানের বয়ান করি শোন দিয়া মন"। (ঐঃ১২৮–১২৯) কবি নিজেও উদযোগী হয়ে পাকিস্তানের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন। তাঁর পরিচালনায় এবং তাঁর স্ত্রী মাহফুজা খাতুনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক নও বাহার (ভাদ্র:–১৩৫৬)' পত্রিকাটির উদ্দশ্য ছিল পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার করা, কমুনিজমের বিস্তার রোধ করা এবং বিশ্ব–মুসলিম জাহানের তামুদ্দনিক–সংযোগ নিবিড় করা"[১]

আসলে এই সময়টা ছিল ভিন্ন ধরনের। এর আগে দেশে ছিল ইংরেজদের রাজত্ব। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে মোটেই ভালো ভাব ছিল না। হিন্দুরা মুসলমানদের সুনজরে দেখত না আর মুসলমানরাও হিন্দুদের ভালবাসত না। দেশের বিভিন্ন এলাকায় তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারপিট চলতেই থাকত। তা ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনের বিষয়টি নিয়েও তাদের মধ্যে বনিবসা ছিল না। মুসলমানগণ পাকিস্তান নামে আলাদা আজাদ দেশ গঠন করতে চাইত। আর হিন্দুরা এর বিরোধিতা করত।[২] উন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের জনসমষ্টি প্রধানত দুই ধর্মাবলীঃ হিন্দু ও মুসলমান। সম্ভবত তখন বাংলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান।[৩] আর. সি. মজুমদার এ সম্পর্কে বলেন –But these were mine points and did not touch the essentials of life. In all vital matters effecting the culture. The Hindus and Muslims live in two watertight compartments as it were." [৪] সমস্যা নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

১. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ ইং, পৃ. ১৩৬–১৩৭

২. এ,কে,এম, মহিউদ্দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ইং, পৃ. ১৮ – ১৯

৩. R.C. Majumder. History of Freedom Movement in India. vol. I firma K.L. Mukhopadhya. Calcatta. 1963. p. 32.

৪. R.C. Majumdar. op. cit P. 34.

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলমান স্বাতন্ত্রের ওপর স্পষ্ট ভাষায় বলেন–এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।"[১]

"আর তাই হিন্দু মুসলমানগণের এই বিভেদ তৎকালীন সকল কবি ও সাহিত্যিকদের লেখায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এছাড়া গোলাম মোস্তফা ১৯২২ সালে রবীন্দ্র নাথের গীতি কবিতার ভাবের সঙ্গে ইসলামী আদর্শের চমৎকার সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং এমনভাবে মুসলমানদের প্রাণের কথা------ জগতের কোন অমুসলমান কবির হাত দিয়া রচিত হয় নাই বলিয়া দাবি করেছিলেন। ১৯৪৩ সালেও তাঁর সে মনোভাব অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালের রচনা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রগতিশীল বিশ্বমানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য বিবেচণা করে ইকবালকে তিনি সেই গৌরব দান করলেন।"[২]

তিনি পাকিস্তানের উপর অনেক গান রচনা করেন যা তৎকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। হিন্দু মুসলিম বিভেদের কারণে পাকিস্তানের উপর লেখা গানগুলো রেকর্ড করতেও কবি গোলাম মোস্তফাকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।[৩] কবি নিজেই এই সম্পর্কে লিখেছেন–"১৯৪৬ সাল থেকেই আমি পাকিস্তানের গান লিখিতে আরম্ভ করি। পাকিস্তানের নূতন যুগ বহন করিয়া আনিতেছে নূতন আশা ও নূতন স্বপ্ন সাধ জাতির মন রাঙাইয়া দিয়াছে। এই যুগে মুসলমান সমাজে পাকিস্তানের গান ইসলামী গানের মতোই যে জনপ্রিয় হইবে এই বিশ্বাস আমার ছিল। আমিও আশ্বাস তাই পাকিস্তানী গান রেকর্ড করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। স্বদেশ প্রেমিক গোলাম মোস্তফার দেশ প্রেম ছিল নিখাদ। আর তাই তৎকালীন সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ খেতাব "সেতারায়ে ইমতিয়াজ'–এ ভূষিত করেন। তিনি প্রাপ্য সম্মানে সম্মানিত হন"।[৪] পাকিস্তানের উপর তিনি বেশ কিছু কাব্য রচনা করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে

১. 'সমস্যা', রাজা–প্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী দশ খন্ড, পৃ. ৪৭৯
২. সাঈদ –উর– রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৩. এ,কে,এম, মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করার জন্য তিনি কবিতার মাধ্যমে আহবান জানান।[১] যেমন –

"সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান
পাকিস্তান সে পাকিস্তান।
আসমানের ওই মিনার চূড়ে উড়ছে কার সুবজ নিশান
পাকিস্তান সে পাকিস্তান ॥
শিল্পী যাহার আঁকলো ছবি কবি যাহার গাইলো গান
রূপ ধরে আজ আসলোরে সেই ধ্যানের ছবি পাকিস্তান;
ফুল ফোটে কার অনুরাগে
ধানের ক্ষেতে দোলা লাগে
পদ্মা– মেঘনা কর্নফূলী কার টানে আজ বয় উজান ॥
পাকিস্তান সে পাকিস্তান
পাকিস্তান সে ইজ্জৎ মোদের আযাদী মোদের মান
ফুলের যেমন খুশবো তেমন আমাদেরও পাকিস্তান।
পাকিস্তান সে মোদের আশা
পাকিস্তান সে মোদের ভাষা
জানো কি ভাই এইদুনিয়ায় ফিরদৌস তোমার সে কোন খান
পাকিস্তান সে পাকিস্তান ॥
জোর কদমে এগিয়ে চলো, ওরে ও তরুণ নওযোয়ান
আযাদ করো মযলুমে আজ, দাও সবারে অভয় দান।
বুক ফুলাও শির উঁচা করো
বীর মুজাহিদ নাহি ডরো।
ঝান্ডা তোমার উঁচা রাখো দেখুক চেয়ে সারা জাহান
পাকিস্তান সে পাকিস্তান।
দুনিয়াতে আজ যুলমাৎভারী, নাইকো ইনসাফ্, নাই ঈমান
কে শুনাবে প্রেমের বাণী, কে করবে মুশকিল আসান
কে মিলাবে আরব – আজম পূরব পশ্চিম সারা জাহান
এক কথায় তার সাফ জবাব দাও
পাকিস্তান সে পাকিস্তন ॥"[২]

এ ছাড়া অপর একটি কবিতায় তাঁর স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফাঃ কাব্যগ্রন্থাবলী;
আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ২৮০
২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

যায়। যেমন –

"ঝির ঝির ঝির ঝির পুবান বাতাসে ধাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।
পাকিস্তানের পাক মুলুকে আমাদের লৈয়া যাও।

পাকিস্তানে রোজ বিহানে
আযান দেয় বুলবুল
হিম–শিশিরে অযু ক'রে
নামাজ পড়ে সব ফুল।
দরিয়া পারে সোনার দ্বীপে
সেই সে পাকিস্তান – শরীফে
আল্লা– নবীর নাম নিয়ে আজ
দাওরে পাড়ি দাও।"[১]

পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ শ্যামল শোভা কবির মনে দোলা দেয়। তাই তিনি লিখেছেন –

" উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান
চাঁদ তারা সাদা আর সুবজ নিশান
আমাদের কওমী নিশান॥"[২]

এ ছাড়াও তিনি পাকিস্তানকে নিয়ে লিখেছেন –

"সকল দেশের চাইতে সেরা পূর্ব–পাকিস্তান
সুজলা–সুফলা সোনার বাংলা– ধরার গুলিস্তান।"[৩]

অপর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন –

---

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ, ২৮৯
৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

"পাকিস্তানের কওমী ফৌজ আমরা পাহারাদার।

চোরা বাজারের শয়তান যতো হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার॥

ধরিব চোর ও মুনাফোখোর

মজুদকারীর ভাঙিব দোর

ছাড়িব না কারো, হোকনা সে বড় নবাব সুবা ও জমিদার।"[১]

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের প্রসিদ্ধ সব জিনিসের বিবরণ পাওয়া যায় তার একটি কবিতায়। যেমন –

"পাকিস্তানের অভাব কী ?

পাকিস্তানের অভাব কী?

(ও ভাই) বরিশালে চাল আছে আর

ঢাকায় আছে গাওয়া ঘি॥

যশোর জিলায় আছেরে ভাই

পাটালি–গুড় খেজুর গাছ

ফরিদপুরে কী মজাদার

পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ!

খুলনায় আছে গাছে গাছে

নারিকেল–পান সুপারী।

পাকিস্তানের অভাব কী॥

বাগেরহাটে, কুষ্টিয়াতে

নারায়গঞ্জে আছে মিল,

মিহিন শাড়ী কিনব মোরা

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

মোমেনশাহী –টাঙ্গাইলে।

গামছা –লুঙ্গি –গেঞ্জি পাবো

পাবনাতে– ভাই ভাবনা কী ?

পাকিস্তানের অভাব কী ॥

শুট্‌কী মাছের সুখটি পাবে

নোয়াখালী চাঁটগাতে

রাজশাহীতে মিষ্টি খাবো

আম খাবো ভাই মালদাতে।

দিনাজপুরের চিড়া খাবো

বগুড়াতে দৈ মাখি

পাকিস্তানের অভাব কী ॥

কুমিল্লাতে কিনবো হুঁকো

তামাক খাবো রংপুরে

সিলেট গিয়ে চা খাবো আর

কমলা খাবো পেটপুরে।

সব আছে, কেউ ঘুচবে না তোর

খুঁৎখঁতে এই স্বভাব কী ?

পাকিস্তানের অভাব কী।"[১]

গোলাম মোস্তফা রচিত একটি গানে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে

"সকল দেশের চাইতে সেরা মোদের বাংলাদেশ

সুজলা–সুফলা শস্য –শ্যামলা স্নিগ্ধ শীতলাবেশ।"[২]

তিনি এই গানটি পাকিস্তান পূর্বকালে রচনা করেছিলেন। পাকিস্তান

---

১. ফিরোজা খাতুন (সম্পাদনা), গোলাম মোস্তফা ; গীতি সঞ্চয়ন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ ইং, পৃ. ২৫

২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে তিনি গানটি পরিবর্তন করেছেন এভাবে–

"সকল দেশের চাইতে সেরা পূর্ব পাকিস্তান

সুজলা–সুফলা সোনার বাংলা ধরার গুলিস্তান।"

মুল গানটির শেষ অন্তরায় আছে –

"হেথা ভায়ে ভায়ে ঘর বেধেছি হিন্দু–মুসলমান

হেথা মন্দিরেতে ঘন্টা বাজে মসজিদে আজান।

মোদের একই আশা একই ভাষা, একই সে স্বদেশ

মোদের বাংলাদেশ।"[১]

কবি একান্ত হৃদয়ে কামনা করেছিলেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তান হবে একটি আদর্শ,রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র। যেখানে কোন লাঞ্ছণা-বঞ্চনা থাকবে না। সকল ক্ষেত্রেই ইনসাফ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে।[২]

জসীম উদ্দীন এই প্রসঙ্গে বলেছেন " পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতীক কবি হিসাবে যদি কাহারও নাম উল্লেখ করিতে হয় তবে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের সকলের নামের আগে গোলাম মোস্তফার নাম উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার নিজের অজান্তে তিনি তাঁর কাব্য সাধনায় এই পাকিস্তান অর্জনের সাধানাই করিয়াছেন। এই প্রশংসা নজরুলের প্রাপ্য নয়। যদিও অতি ভক্তির সঙ্গে কেহ কেহ নজরুলের প্রতি এই প্রশংসা আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু নজরুলের কাব্যাদর্শ যদি বাঙালী মুসলমানেরা গ্রহণ করিত তবে ভারত স্বাধীন হইত, কিন্তু মুসলমানেরা পাকিস্তান অর্জন করিতে পারিত না।"[৩]

---

১. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশন–ঢাকা, ১৯৯৮ইং, পৃ. ৩৯

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৩. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী–ঢাকা, ১৯৯৮ইং, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও গোলাম মোস্তফা

গোলাম মোস্তফা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মনে করতেন যে রাষ্ট্র ভাষার মত একটা বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে বৃহত্তর ঐক্য বজায় রাখতে গেলে একটুছাড় দিয়ে হলেও বাংলার স্থলে ঊর্দূকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মেনে নেয়া উচিত।[১] তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন প্রতিবেশী সমাজের কাছে উপমহাদেশের মুসলমানগণ কিভাবে নির্যাতিত ও কলঙ্কিত হয়েছেন।[২] এ সম্পর্কে কবি জসীম উদ্দীন লিখেছেন– "পাকিস্তান অর্জিত হইলে তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থান করিতে কবি গোলাম মোস্তফা দেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঊর্দূকে সমর্থন করেছিলেন। ইহার পিছনেও তাঁহার মানসিকতা অন্যভাবে কাজ করিতেছিল। সারা জীবন কাব্য সাধনায় তিনি হিন্দু সমাজের কাছে তেমন উৎসাহ তো পানই নাই বরঞ্চ নজরুলের সাথে আদর্শবাদের লড়াই এ তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষকে হিন্দু সমাজের সহানুভূতির মধ্যে দেখিয়াছেন।"[৩]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে গোলাম মোস্তফা যখন উর্দুর পক্ষে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন তখন তাঁকে নিয়ে বেশ টানা হেচড়া হয়েছিল। কোন কোন মহল থেকে তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৪] এ সব তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ঊর্দুর পক্ষে তাঁরত বক্তব্য আরোও স্পষ্ট করার জন্য " পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা: উর্দূ না বাংলা? শীর্ষক একটি বই রচনা করেন। তিনি সে পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছেন – "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দ্দু হবে , না বাংলা ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বেদনা –বোধ করিতেছি। নবজাতক পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনায় সময় এইরূপ আত্মকলহ সত্যই মারাত্মক।পরিচ্ছন্ন মন এবং সুদূর প্রসারী দৃষ্টি লইয়া ধীর স্থিরভাবে বিষয়টি ভাবিয়া দেখা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন।"[৫]

---

১. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

২. ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত, কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ইং, পৃ. ২২

৩. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯৮ইং পৃ. ১০৭

৪. গোলাম মোস্তফা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯৫ ইসলামপুর–ঢাকা, পৃ.১

৫. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ.–১.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সেখানে আরও বলেছেন –"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আমার মতামত কায়েদে আজম জিন্নার ঘোষণার বহু পূর্বেই আমি ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছি। গত বছর নভেম্বর মাসে ঢাকার এক সাহিত্য–সভায় আমি বলিয়াছিলাম গোটা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দূই হইবে, তবে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার বাহন রূপে আমরা বাংলা ভাষাকে চাই। এই কথাও বলিয়াছিলাম। সমগ্র পাকিস্তানের ঐক্য এবং সংহতির জন্য আমাদের যেমন উর্দূ শিখা উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাদিগের ও তেমনি বাংলা শিখা উচিত।"[১] সে দিনের সেই বক্তৃতার বিবরণে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা গোলাম মোস্তফাকে বাংলায় ভাষার ঘোর বিরোধী হিসেবে রিপোর্ট প্রকাশ করে। একমাত্র Hindustan Standard পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার একটি বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন।

Hindustan Standard –এ রিপোর্টের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ –

"Poet Gholam Mustafa said that those who wanted to make Bengli as the state language of Pakistan were looking at a narrow angle of geographical limits : but if they consider Pakistan as a dynamic unifying force in the world. they could not brush aside Urdu. He was inclind to the view that Bengali languasge was responsible for the decline of the Bengali Mustims as that language reflects the ideas of non- Muslims. He however. had no objection if Bengali was made the state language of East Bengal."[২]

গোলাম মোস্তফা বেদনাহত হৃদয়ে লিখেছেন, "আজ বাংলা ভাষার জন্য যাঁহারা আন্দোলন চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে আমার চেয়ে বাংলা ভাষার অনুরাগী কয়জন আছেন জানিনা। ত্রিশ বৎসরের উর্ধকাল ধরিয়া আমি বাংলা

১. The Hindustan Standard. 12th November-1947.

২. গোলাম মোস্তফা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯৫ ইসলামপুর রোড, ঢাকা– পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি এবং দেশ ও জাতির জন্য যাহা কিছু দান করিয়াছি, বাংলা ভাষাতেই করিয়াছি। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হউক না হউক, এ প্রশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়াই আমি বাংলা ভাষাকে ভালবাসি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষাতেই আমি সাহিত্য চর্চা করিব। এ কথাও অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে পারি।"[১]

গোলাম মোস্তফার মতে " রাষ্ট্রভাষা নিয়া এমন কিছু বাড়াবাড়ি করা আমাদের উচিত নহে। যাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পন্ড হইয়া যায়। রাষ্ট্রভাষা নিয়া মারামারি করিতে গিয়া যদি আমাদের রাষ্ট্র-ই চলিয়া যায়। তবে শুধু রাষ্ট্র ভাষা নিয়া আমরা কি করিব"[২] তিনি বইটির শেষ সিদ্ধান্তে লিখেছেন – "উর্দূই হইবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং তাহার সহিত সংস্রব রাখিয়া বাংলা হইবে আমাদের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা, ও শিক্ষার মাধ্যমে।"[৩] কারণ তাঁর যুক্তি ছিল – "পাকিস্তান যখন একটি স্টেট এবং বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে একতা ও সংহতিই যখন একান্ত প্রয়োজন। তখন বাঙালি মুসলমানকে শুধু উর্দূ পড়িলেই চলিবে না। পশ্চিমা মুসলমানদিগকেও বাংলা পড়িতে হইবে।"[৪]

গোলাম মোস্তফা ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত, ভাষা সংস্কার কমিটির সম্পাদকরূপে যোগ দেন। আবদুল হাকিম এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন –"দেশ বিভাগের পর কবি ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন বলে আমার মনে হয়। তারপর তদানীন্তন পূর্ব বাঙলা সরকার কর্তৃক গঠিত "ভাষা সংস্কার কমিটির (১৯৪৮)" সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এই পদটিই বোধ হয় তাঁর সরকারী চাকুরী জীবনের শেষ পদ। এ সময় কবির ঢাকায় অবস্থান হেতু আমার সঙ্গে প্রায় সাক্ষাৎ হত। উক্ত পদের কার্যকাল এবং নিজের চাকুরী

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৪. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই তিনি একদিন হঠাৎ আমার অফিসে এসে অম্লান বদনে, বিনা দ্বিধায় বলে ফেললেন, চাকুরী খতম করলাম।"[১] তিনি আরো লিখেন–"কবি এই সময় একটা শক্তিশালী বাঙলা ভাষা বিরোধী মিশ্রচক্রের সান্নিধ্যে এসে তাদের বেড়াজালে আটকা পড়বার মত হয়েছিলেন। চক্র নানা ছলে রটাতে চেষ্টা করছিল যে এত বড় জনপ্রিয় বাঙালী কবিও তাদের সাথে রয়েছেন এবং বাংলা ভাষাকে উর্দূ হরফে লিখবার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। কবি যে ভাষা সংস্কার কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন তদ্বারা উক্ত মতের পরিপোষক সুপারিশ করবার জন্য ঐ চক্র থেকে পীড়াপীড়ি শুরু হয়।"[২]

কবিকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা কখনই বিশ্বাস করতে পারতেন না যে তিনি বাঙলা ভাষা বিরোধী উক্ত চক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের কার্যসিদ্ধির সহায়ক হতে পারেন।[৩]

শাইখ শরফুদ্দীন "কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণে" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখেছেন –"তাঁর গ্রন্থাবলী ও আলোচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে তাঁর চরিত্রের যে দিকটা সবচেয়ে জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটা হল ইসলামী জীবন দর্শনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও গভীর দরদ। এ জন্য তিনি ইসলামী বিষয়ে গবেষণাতেও মনোসংযোগ করেছিলেন। আরবী ভাষায় সুপন্ডিত না হলেও কুরআন মজীদ পাঠ ও তরজমা উপলক্ষ্যে আরবী ভাষার প্রতি তিনি বিশেভাবে ঝুঁকে পড়েন। এমনকি তিনি বাংলা ভাষাতেও আরবী হরফ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে কেউ কেউ তাঁকে বাংলা আরবী হরফের উদ্যোক্তা এডুকেশন সেক্রেটারী ফাযলী সাহেবের ধামাধরা বলে বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, প্রকৃত ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ গোলাম মোস্তফা সাহেবকে পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত করার পরপরই ফাযলী সাহেবের মতবিরোধের ফলেই তিনি এ কমিটির সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করেন। এমনকি এই

১. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৩. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

উপলক্ষ্যে তাঁর আসল সরকারী চাকুরী হেড মাষ্টার পদেও ইস্তফা দিয়ে তিনি নিবিষ্টভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন।[১] দীর্ঘকালের চাকুরীটি ছেড়ে দিয়ে কবি তাঁর নিজস্ব কাব্য ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এ সময় তাঁর সক্রিয় পরিচালনায় একখানা উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ঢাকা থেকে বের হত।[২] সাহিত্য সাধনায় স্বাধীনভাবে মশগুল হতে পেরে কবি যেন আগের চেয়ে অধিকতর আনন্দময় জীবন–যাপন করতে থাকেন।[৩] কবি গোলাম মোস্তফা নির্দ্বিধায় একজন দেশপ্রেমিক ও বাংলাভাষা প্রেমিক ছিলেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পাকিস্তান প্রত্যয়ী কবি গোলাম মোস্তফা ১৯৫২'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় একটি কবিতার বই প্রকাশ করেন। ঐ কবিতায় তিনি লিখেছেন –

"ভাষার দ্বন্দ্ব ? ও কথা তুলিয়া দিওনা লাজ;

মোহাম্বতের রাষ্ট্রভাষায় দিলে দিলে কথা কহিব আজ! "[৪]

গোলাম মোস্তফা পাকিস্তান পূর্বকালে রচিত একটি গানে লিখেছেন–

"মোদের সোনার বাংলা ভাষা

সকল ভাষার চাইতে খাসা

প্রাণের চেয়ে প্রিয় সে যে

সবার চেয়ে ভালবাসা।

– – – – – – – – – – – – – –

এই ভাষারি পীযুষ মুখে

নয়ন মেলি মায়ের বুকে

---

১. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯–৮০

২. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৩. খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ সংখ্যা এপ্রিল–জুন – ৯৮ সংখ্যা, পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

হাসি কাঁদি সুখে দুখে

মিটাই মনের সাধ পিয়াসা॥

এই ভাষাতেই স্বপন দেখি,

এই ভাষাতেই লেখন লেখি।

ফুলের বুকে গন্ধ যেমন –

বাংলাভাষা মোদের তেমন,

এই ভাষাতেই শেষের শয়ন

পাই যেন এই মনের আশা॥ "[১]

এছাড়া তাঁর রচিত অপর একটি গানে আছে –

"মোদের একই আশা একই ভাষা, একই স্বদেশ

মোদের বাংলাদেশ॥"

১. ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত, গোলাম মোস্তফা, গীতি সঞ্চয়ন, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৬৮ ইং, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্মে ইসলামী ভাবধারা

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলী

গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক অবদান মুসলিম বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দান পল্লবিত হয়ে আছে। তিনি যে কেবল মাত্র কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়–সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তিনি দান করেছেন অনেক কিছু। খন্ডকাব্য, মহাকাব্য, গীতি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস রস রচনা, ঐতিহাসিক বিষয়ক রচনা, দার্শনিক ও ধর্মালোচনা, সংগীত রচনা, প্রবন্ধ রচনা, কোরআন শরীফ বাংলায় অনুবাদকরণ, নতুন নতুন ছন্দ প্রবর্তন ইত্যাদি।এছাড়াওঅন্যভাষা হতে অনুবাদ করেন ইখওয়ানুস সাফা, মুসাদ্দাস–ই–হালী, ইকবালের কাব্যের অনুবাদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর দান স্বীকৃতি লাভ করেছে।[১]

গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি সাহিত্য ইতিহাসে খ্যাত এবং এই বইটির জন্যই তিনি আজও সকলের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছেন।এছাড়াও তিনি 'মরু দুলাল' নামক বিশ্বনবীর কিশোর সংস্করণ প্রকাশ করেন। হযরত আবু বকরের জীবনী সম্বলিত তাঁর গ্রন্থটি হল 'হযরত আবু বকর'। এখওয়ানুস সাফা'র বাংলা অনুবাদে তিনি 'জয় পরাজয়', গল্পটি রচনা করেন।

এছাড়া তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–'আমার চিন্তাধারা', 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন'। কবির লেখা বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে রচিত হয়েছে 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন'।

'রূপের নেশা','ভাঙা বুক','এক মন একপ্রাণ' কবির লেখা উপন্যাস গ্রন্থ। 'ভাঙাবুক' গ্রন্থটির উর্দূ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে 'দিল জো টুট গেয়ী' শিরোনামে।[২]

তিনি কতগুলো পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। যেমন–"আলোক মালা"

---

১. আব্দুস সাত্তার (সম্পাদক), ছোটদের জীবনীগ্রন্থ (২২), আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা–১৯ পৃ. ২৫

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, এপ্রিল–মে–জুন সংখ্যা, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

সিরিজ গ্রন্থ "আলোক মঞ্জুরী" সিরিজ গ্রন্থ "মঞ্জুলেখা" (যৌথভাবে কলাশিল্পী মনোজ বসুর সাথে), "মনি মুকুর (যৌথভাবে কথা শিল্পী মনোজ বসুর সাথে), "খোকা-খুকুর বই", "নতুন বাংলা ব্যাকরণ", " School boys Translation" ইত্যাদি।[১]

ইংরেজী সাহিত্যে ও তাঁর অধিকার ছিল। তিনি সুন্দর ও সাবলীল ইংরেজী লিখতে পারতেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ সমূহ তৎসময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেমন-তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা The Dawn","The comoned". .The Anritya Bazare Potrika", "The stateman". "The Musalman". "The star of India". "The Morning News". "The Pakistan Observer". ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেখা হচ্ছে-The State language of Pakistan". Arabic the Mother Alphabet of the World". Mohammad the Crown of Creation". The Indus Vally Civilization" ইত্যাদি।[২] "The Morning News".তাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ "He is also a fine Prose writer both in Bengali and English".[৩]

তিনি "গীতি সঞ্চয়ন" নামক একটি গানের বই রচনা করেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি হারমোনিয়াম, অর্গান, পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠে গাওয়া কয়েকটি গান অবিভক্ত বাংলায় রেকর্ড হয়েছিল। তাঁর গান ভারত ও পাকিস্তানের খ্যাতিমান কণ্ঠ শিল্পীর দ্বারা গীত হয়েছে।[৪] এছাড়া তৎকালীন পাকিস্তান পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে তাঁর লেখা বহু গান বাজারে বের হয়। আব্বাস উদ্দীন কবির লেখা অনেক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন।

গোলাম মোস্তফা মূলতঃ কবি ছিলেন। তাঁর লেখা কবিতা গ্রন্থগুলো হল-"রক্তরাগ" "হাস্নাহেনা", "খোশরোজ", "কাব্য কাহিনী", "সাহারা", "শেষক্রন্দন", "বুলবুলিস্তান" "তারানা-ই-পাকিস্তান " "বনি আদম" (মহাকাব্য)" ইত্যাদি।

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যা, পৃ. ২২০

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যা, পৃ. ২২০

৩. আব্দুস সাত্তার (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যা, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

তিনি স্কুলের ছাত্র অবস্থায় লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর সর্বপ্রথম লেখা "আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার" ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তাঁর লেখার গতি অব্যাহত ছিল। তিনি ছিলেন একজন সব্যসাচী লেখক।[১] তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না তবুও তিনি 'ইসলাম ও কমিউনিজম' গ্রন্থটি রচনা করেন। এছাড়া তিনি " ইসলাম ও জেহাদ" নামক গ্রন্থটি ইসলাম ধর্মের আলোকে রচনা করেন। গোলাম মোস্তফা রচিত গ্রন্থ সমূহের নাম দেয়া হল।

পাকিস্তান পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ -

১। রূপের নেশা (উপন্যাস- ১৩৩২ বঙ্গাব্দ),

২। ভাঙাবুক (উপন্যাস- ১৯২১ ইং),

৩। রক্তরাগ (কবিতা - ১৯২৪ ইং),

৪। (ক) হাস্নাহেনা কবিতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ),

(খ) হাস্নাহোনা (কবিতা সংগ্রহ, ১৯৩৭ইং),

৫. খোশরোজ (কবিতা , ১৯২৯ ইং)

৬. সাহারা (কবিতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ),

৭. কাব্য কাহিনী (কবিতা, ১৯৩৮ ইং),

৮. মোসাদ্দাস -ই- হালী (অনুবাদ কবিতা, ১৯৪১ইং)এবং

৯. বিশ্বনবী (জীবনী, ১৯৪২ইং),

পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত গ্রন্থ -

১. ইসলাম ও জেহাদ (ধর্ম বিষয়ক, ১৯৪৭),

২. মরু দুলাল (জীবনী), ১৯৪৮ ইং

৩. বুলবুলিস্তান (কাব্য সংকলন, ১৯৪৯ইং)

৪. ইসলাম ও কমিউনিজম (রাজনীতি বিষয়ক, ১৯৪৯ ইং),

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যা, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

৫. তারানা -ই-পাকিস্তান (কবিতা, ১৯৫৬ইং);

৬. কালাম-ই-ইকবাল, (ইকবাল কাব্যের অনুবাদ, ১৯৫৭ইং)

৭. আল কুরআন (বাংলা কাব্য অনুবাদ ,১৯৫৭ ইং);

৮. বনি আদম ,প্রথম খন্ড (কবিতা ,১৯৫৮ইং);

৯. বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য (জীবনী, ১৯৬০ ইং);

১০. শিকওয়া ও জবাব -ই- শিকওয়া (অনুবাদ কবিতা ,১৯৬০ইং)

১১. অবিস্মরণীয় বই (ইতিহাস, সম্পাদনা, ১৯৬০ ইং);

১২. আমার চিন্তাধারা (প্রবন্ধ সংকলন,১৯৬২ ইং);

১৩. হযরত আবু বকর (জীবনী, ১৯৬৫ ইং);

১৪. কাব্য সংকলন (কবিতা, সৈয়দ আশরাফ আলী সম্পাদিত, ১৯৬০ ইং);

১৫. গীতি সঞ্চয়ন (গান, ফিরোজা খাতুন সম্পাদিত,১৯৬৮ ইং);

১৬.কাব্য গ্রন্থাবলী প্রথম খন্ড (কবিতা, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, ১৯৭১ ইং);

১৭. পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা (রাজনীতি,প্রকাশ কাল উল্লেখ নাই) ।

* (গ্রন্থ সমূহের তালিকা তৈরী করা হয়েছে, আলী আহমদঃ বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৫ ইং পৃঃ ৩৯৯ -৪০৩ ।)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্য

সাহিত্য হচ্ছে মানব হৃদয়ের প্রাণ ধর্ম। মানব মনের ভাবাবেগ, অনুভূতি ও আশা আকাঙ্খা সার্বজনীন। সাহিত্য শব্দ বা ভাষার আশ্রয়ে সৃষ্টি বাক্য, নাটিকা, গল্প, উপন্যাস,প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।[১] তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, সাহিত্যকে ইসলমী সাহিত্য বললে সাহিত্যের অপমান করা হয়, আর ইসলামকে করা হয় হেয়। প্রকৃতপক্ষে এরকম মনোভাবের মধ্যে আছে সাহিত্য ও ইসলাম -এই দু'টো বিষয়কেই বুঝায় ভুল। সাহিত্য তো সবই এক- তবুও রুশ সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, জার্মান সাহিত্য, হিন্দু সাহিত্য ইত্যাদি পরিচিতি বিদ্যমান। যদি কোন ব্যক্তি ইংরেজী সাহিত্যকে ঐ নামে অভিহিত করেন, তা-কি সত্যিই অবমাননা করা, না সাহিত্য সম্পর্কে সত্য ভাষণ?[২]

ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন ধর্ম। ইসলামী সাহিত্যও তেমনি বিশ্বজনীন ও উদার। ইসলামী কোন জিনিসই সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক, ধর্মই হোক, সংস্কৃতিই হোক, সামাজিক হোক, শিল্পই হোক -ইসলাম সর্বএই মিলেছে ও মিলিয়েছে। খন্ডতা ও ক্ষুদ্রতার স্বল্প যেখানেই ভীড় জমিয়েছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের জন্য স্থান -সংকুলান করাই ত ইসলামের কাজ। নিজেও থাকবে, অপরকেও থাকতে দেবে। এই Co-existence-ই হল তার নীতি।[৩]

তাই ইসলাম মুসলিমের দৃষ্টি সংকীর্ণ করে শুধু ধর্মীয় কিতাব পাঠ করতে বলেনি দুনিয়ার সেরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মন্থন করতেই বার বার প্রেরণা দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জ্ঞানের মূল্য সর্ম্পকে বলেছেন-

"তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কারণ আল্লাহর পথে জ্ঞান অর্জন করা পূণ্যের কাজ। জ্ঞানের আলোচনা করা আল্লাহর প্রশংসার সমান, জ্ঞানের চর্চা জিহাদের সমান, জ্ঞানের অন্বেষণ ইবাদতের সমান, জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দানের সমান, আর উপযুক্ত ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সমান। জ্ঞান তার অধিকারীকে ভাল-মন্দের বিচার ক্ষমতা

---

১. ড. হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ইং, পৃ. ১৯৭
২. গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার,ঢাকা–১৯ পৃ. ১৭৩
৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮ইং, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

দান করে; জ্ঞান বেহেশতের রাস্তা আলোকিত করে; জ্ঞান মরুভূমিতে আমাদের বন্ধু , নির্জনতায় আমাদের সহচর। বন্ধু বিবর্জিত অবস্থায় আমাদের দোসর ; জ্ঞান আমাদেরকে সুখের পথে নিয়ে যায়। দুঃখের মধ্যে সঞ্জীবিত রাখে, সমাজে অঙ্গের ভূষণ হয়, শত্রুতার বিরুদ্ধে বর্মের কাজ করে। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর বান্দা মহত্বের শিখরে আর সম্ভ্রমের মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইহজগতে বাদশাহ্‌র সমাদর লাভ করে। আর পরকালে পরম সুখ অর্জন করে।"[১]

তাই যে প্রত্যয় বা চিন্তাধারা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, রীতি-নীতি যা তওহীদবাদ ও সার্বজনীন নীতির বিরোধী নয়, তাকে ইসলামী তমুদ্ধন বলা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি ইসলামী শিক্ষার আঙ্গিকে হয় তবে তা গ্রহনীয়। ইসলামে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মিলনের মনোবৃত্তি সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞান কর্ষণের ক্ষেত্রে। গ্রীকের প্লেটো, ইসলামের আফলাতুন আর সক্রেটিস আমাদের বেখরাত, অগ্নি উপাসক ইরানবাসীর পেহ্‌লবী ভাষা এখন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। মাওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয় 'পেহলবী ভাষার কুরআন'।

মসনবী -এ মানবী -এ মৌলভী

হাস্ত কুঁরআ দর জবানে পেহলবী,

এ ভাষাতেই লেখা হল 'শাহনামা' জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কর্ডোভা, গ্রানাডা, বাগদাদ,দিল্লী, আগ্রা সর্বত্রই একই সুর বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান বৈষম্যের মধ্যে মিলনের আহবান।[২]

আবার বাংলা ভাষাতে কোন সাহিত্য লেখা হলে যেমন তা ইসলামী সাহিত্য হবে না তেমনি ইসলাম বিরোধীও হবে না। যে ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হউক না কেন, তা দিয়ে ইসলাম সংগত ও ইসলাম বিরোধী ভাবধারা প্রচার করা যায়না। আল্লাহ্‌ ভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলেছেন -"বিভিন্ন ভাষা ও রঙ সৃষ্টির ভেতরে মানুষের জন্যে রয়েছে অজস্র

১. সায়্যিদ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম (অনু.অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং, পৃ. ৩৭৯

২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তার খোরাক।"[১] তাই সাদা-কালোর বিরোধ , জাতিগত বিদ্বেষ বা ভাষা বিদ্বেষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উদ্দেশের ঘোর বিরোধী। কুরআন শরীফ প্রথমতঃ ছিল আরববাসীর (অবশ্য এর গূঢ় উদ্দেশ্য ও সম্বোধন রয়েছে তামাম জাহানের মানব জাতির জন্য)। আর তাই কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন- "আরবী ভাষায় কুরআন রয়েছে,যাতে তোমাদের বোধগম্য হয়।"[২] উক্ত আয়াত দ্বারা এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। কাজেই একথা স্পষ্ট যে, ভাষাগত পার্থক্য, জীবিকার পার্থক্য কখনোই আর্দশিক পার্থক্য হতে পারে না । কারণ ইসলামী আদর্শ ভাষা ভিত্তিক বা অঞ্চল ভিত্তিক নয়। আর তাই ইসলামী জীবনবোধ থেকে পাওয়া মৌলিক ভাবের উপরই নির্ভর করে ইসলামী তমুদ্দুনের ও ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তি। ভাষাগত আধিপত্য বা অন্য যেকোন রকমের সংকীর্ণতা ইসলামের প্রকৃত অগ্রগতির পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর।[৩] গোলাম মোস্তফা এই সর্ম্পকে বলেছেন -

"ইসলামের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন নাই। ইসলামের কোন Frontier বা সীমা প্রাচীর নাই। তার Supra geographical or Supra national রূপ রয়েছে। ইংরেজ কবি যেখানে বলেছেন-

"The West is west, the East is East

The twain shall never meet."

ইসলামের কবি সেখানে গেয়েছেনঃ

"চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তান হামারা,

মুসলিম হ্যাঁয় হাম ওতান হ্যায়, সারা জাঁহা হামারা।"[৪]

ডঃ হাসান জামান এই বিষয়ে লিখেছেন-ইসলাম তাই মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের এক সুষ্ঠু জীবন ধারা দিতে পেরেছে। সামাজিক ফল খারাপ না হলে ও তওহীদবাদের বিরোধী না হলে শিক্ষা -সাহিত্যের বিকাশ ও অগ্রগতি কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী তমুদ্দুন বিরোধী নয়। মানব সমাজের সুষ্ঠু সংগঠনের জন্যে আল্লাহ্‌ ইসলাম নাযিল করেছেন, যার

---

১. আল কুরআন, সূরা রুম, আয়াত নং –২২

২. আল কুরআন, সূরা ফুসিলাত, আয়াত নং–৪৪

৩. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বিশ্ব সৃষ্টির ও সৌন্দর্যের কোন বিরোধিতা নাই। বরং একটি অপরটির পরিপূরক । বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইসলামের মৌলিক ভাবধারাকে দুর্বল করা তো দূরের কথা তাকে সফল করেছে। তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। [১]

ইসলামী সাহিত্য বলতে তাই বুঝতে হবে, ইসলামী জীবন বোধের প্রকাশ মূলক সাহিত্য। এই সাহিত্য আবার দু-পর্যায়ের (ক) ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কীয় সাহিত্য; (খ) প্রথমত ঃ ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য মারফত (উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ) এ জীবন দর্শনের বিচিত্র বিকাশ, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের জীবনের ছবি যে সাহিত্যে রূপ লাভ করে;এ জীবন অবশ্যই কেবলমাত্র মুসলিমগণের জীবন নয় মুসলিমগণের সংগে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের যে সম্পর্ক তার মধ্যে নিহিত রয়েছে; এই সম্পর্ক নিয়ে মুসলমানের জীবনে যে সাহিত্য প্রতিভাত হয়; তাকেও ইসলামী সাহিত্য বলা যেতে পারে। এর মধ্যেও থাকবে নাটক , কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের অযুত সম্ভার। তৃতীয়তঃ মুসলমানের লেখা সাহিত্য । কিন্তু যেহেতু মুসলমানের লেখা হলেই তাতে ইসলামী জীবনবোধ ও মুসলিম জীবনধারার বিকাশ নাও হতে পারে। সে কারণে প্রথমতঃ ধর্মীয় সাহিত্য ও ব্যাপক অর্থে ইসলামী জীবনবোধের প্রকাশ ও মুসলিম জীবনের ছবি যে সাহিত্যে থাকবে সে সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যের মানদন্ড ধরতে হবে। [২]

এছাড়া ইসলামী জীবন দর্শনের দিক দিয়ে বিচার করলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্য মন্থন ও উপভোগ করা ও বিচিত্র সাহিত্য রচনা করাতে কোন বাধাই নাই। বিশেষতঃ আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখা আদান প্রদানের উপরই নিহিত রয়েছে। তবে রস আস্বাদন করা এবং কোনও সাহিত্যে অন্তর্নিহিত নীতিবোধ জীবনাদর্শ হিসেবে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা পৃথক ব্যাপার। তবে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, লব্ধ জ্ঞানকে নিজস্ব জীবনবোধ হতে বিচ্ছিন্ন করলে স্বার্থক সৃষ্টি হয় না। [৩] বর্তমান যুগের নৈতিক মূল্যমান সম্বন্ধে স্থির ধারণার অভাব

১. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-৯৮

৩. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যণীয়। এ জন্য সাহিত্যের সারাংশকে জীবনে গ্রহণ করতে হলে নিজ নিজ জীবনবোধের মানদন্ড বিচার করে স্বীয় জীবনে গ্রহন করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে T.S.Eliot তাঁর "Religion and Literature" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন -Eliot We shall certainly continue to read the best of its kind (literature) of what our time provides. but we must tirelessly criticise. it according to our own principles. The greatnes of literature cannot be determined solely by literary standards though we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standards." ১

১. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

গোলাম মোস্তফা বাংলা সাহিত্যের গদ্য লেখক হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন না। তবুও বংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ লেখক হিসেবে তিনি সুউচ্চ আসনের অধিকারী। তার সকল রচনাই আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী, নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং ইসলামের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমকালীন চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "আদর্শবাদী লেখক হিসেবে কবি ছিলেন সুবিখ্যাত। তাঁর গদ্য রচনার বিশিষ্টভঙ্গী কাব্যময় বাক-বিন্যাস সহজে পাঠককে বিমুগ্ধ করে। গভীর চিন্তা তর্ক ও ধারালো যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেছেন চারু-গদ্যের অভ্যস্ত বিন্যাসে।"[১]

সব্যসাচী সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফার লিখা প্রবন্ধসমূহ আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহ হতেতিনি যে সমাজ সচেতন, ইসলামী আদর্শের অনুরাগী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। "বর্তমান শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কবির অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো আত্মবিস্মৃত বাংলার মুসলমানকে সচেতন করে তুলছে। এসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" (১৯১৭)। 'সামিক মোহাম্মদী' (১৯৬১), 'সওগাত' (১৯১৭), 'ইসলাম ও দর্শন' (১৯২৭), সত্যবার্তা, 'মোয়াজ্জিন'(১৯৩৮) প্রভৃতি পত্রিকায়। গোলাম মোস্তফা ইংরেজীতেও বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। সেকালের বিখ্যাত ইংরেজী কাগজ যেমন– The Musalman. 'The Star of India'. The Morning News'. 'The Pakistan Ovserver'. 'The Don' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রায় নিয়মিত লিখতেন।"[২]

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল মে জুন ৯৮ সংখ্যা, পৃ. ১৪৫

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে গোলাম মোস্তফা কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ 'আমার চিন্তধারা'। উক্ত গ্রন্থে ১৯১৭ থেকে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা বিভিন্ন বিষয়ে গোলাম মোস্তফা কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ক্ষুদ্র–বৃহৎ নিবন্ধের আকারে যা প্রকাশ করেন এ বই তার সুনির্বাচিত সংকলন। কালের প্রবাহের সঙ্গে কবির চিন্তা বিবর্তনে যে বিচিত্র পথে বিকাশ লাভ করে, তার স্বাক্ষর বহন করে গদ্যও যেন বিচিত্র ভঙ্গীতে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠার অধিকার অর্জন করেছে। "এমন এক সময় গোলাম মোস্তফার জন্ম হয়েছিল যখন তার স্বধর্মীয় সমাজ অর্থাৎ বাংলার মুসলিম জনসমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, তারা ছিল সর্বক্ষেত্রে শোষিত, পীড়িত, নিগৃহীত, ও অপাংক্তেয়।"[১] আর তাই গোলাম মোস্তফা চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ দ্বারা স্বতন্ত্র এক সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করা হোক। গোলাম মোস্তফার ভাষায়– "বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ভাবধারায় মুসলমানের জাতীয় সত্তা যে সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইতে পারিতেছে না তাহার জন্য যে স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটিয়াছে এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন।"[২] এ কথাগুলো তিনি ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে 'মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য' শিরোনামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি আরো লিখেছেন, "বাংলা ভাষা প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের হস্তেই লালিত ও পালিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানদের গাফলতির ফলে তার তালিম কিন্তু পুরাদস্তুর মুসলিম জনোচিত হয় নাই। পুঁথি সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় তার ধারা ও আদর্শ কিছুটা ত্রুটি ঘটিয়াছিল। নিজেদের শৈথিল্য, অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার ফলে এ ভাষা কালে কালে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কতিপয় ইংরেজ পাদ্রী ও হিন্দু পন্ডিতদের মিলিত চেষ্টায় বাংলাভাষার রূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। এতদিন বাংলা ছিল আরবী, ফারসি শব্দ মিশ্রিত

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

২. গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৬২ইং পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু–মুসলমানের সাধারণ ভাষা; কিন্তু এখন হইতে হিন্দু পন্ডিতেরা আরবী, ফারসি শব্দ বর্জন করিয়া ইহাকে সংস্কৃতমুখীন করিয়া তুলিলেন; ফলে মুসলমানদিগের বাংলা জবান কোণঠাসা হইয়া গেল। এক শতাব্দী পরে মুসলমানদের আবার চৈতন্যোদয় হইতেছে।বাংলা ভাষাকে তাহারা আবার আপনার করিয়া লইবার সাধনায় মগ্ন হইয়াছে।"[১] এ প্রবন্ধটি গোলাম মোস্তফার সমকালীন জাতীয় চেতনারই ফল।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে গোলাম মোস্তফা কর্তৃক রচিত "বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়' নামক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বাংলা লিপির ইতিহাস সেই প্রাচীন যুগ হতে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছেন যে, "বাংলা ভাষার সংগঠনে সংস্কৃত হইতে যতটুকু সাহায্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা এবং কাজেই আর্যভাষা এই দাবি অস্বীকার করি। আর্যামির গোঁড়ামি হইতে বাংলা ভাষাকে আমরা মুক্ত রাখিতে চাই। ইহাই হইবে বাংলা ভাষার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ।"[২]

১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শিশুর শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে তিনি শিশুর পিতা–মাতা শিশুকে কিভাবে গড়বে সেসম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে শিশু শিক্ষার মূলনীতি হবে "Neither slave nor tyrant অর্থাৎ শিশুকে একেবারে ক্রীতদাসও করা হইবে না, আবার তাহাকে দারুণ ডংকাবাজও করা হইবে না।"[৩] ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মাসিক মোহাম্মদীতে তার 'আর্টের স্বরূপ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি আর্ট কি, আর্ট ও সত্য, আর্ট ও মঙ্গল, আর্ট ও নীতি, আর্ট ও মনোবিজ্ঞান, আর্ট ও প্রকৃতি, আর্ট ও মানব জীবন, আর্টে সার্বজনীনতা ও সহজবোধ্যতা, আর্টের খাতিরে আর্ট, আর্টের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে আর্টের যে স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অনন্যতার দাবীদার। তিনি বিভিন্ন

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২. গোলাম মোস্তফা ঃ প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনায় মাহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৬৮ইং পৃ. ১৮৯
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিকদের Art সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে Art সম্পর্কে নিজস্ব মতামত দিয়েছেন এ ভাবে–"আর্ট মানব জীবনেরই একটি ক্রিয়া বা অবস্থা, মানুষের মনোভাবের পরস্পর আদান–প্রদানেরই ইহা অন্যতম উপায় স্বরূপ। বাকশক্তি যেমন মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় অপর সকলের নিকট পৌছাইয়া দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ স্থাপন করে আর্টও তদ্রূপ মানুষের অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতিকে অপর হৃদয়ে পৌছাইয়া দেয়। মানুষ যাহা চিন্তা করে বা দেখে তাহা কথার দ্বারা অনায়াসে সে অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে; কিন্তু অন্তরের অন্ত স্থলে সে যাহা অনুভব করে তাহা সাধারণ কথার দ্বারা সম্যক প্রকাশ পায় না, সেইখানে আর্টের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আর্টকে অনুভূতির ভাষা বলা যাইতে পারে। নিজ অন্তরে যাহা অনুভব করা যায় অপর হৃদয়ে তাহাই অবিকল পৌছাইয়া দিবার কলা–কৌশলই আর্ট।" আর্টের সার্থকতা মানব জীবনে 'জীবনের মাঝে আর্টকে এভাবে গ্রহণ করলে তখন আর Art for Art's sake' থাকে না, তখন হয় Art for man's sake"।[১]

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে মাসিক মোহাম্মদীতে 'শক্তি পরীক্ষায় মুসলমান' শীর্ষক অপর এক নিবন্ধে, গোলাম মোস্তফা ইসলামের ইতিহাসের আলোকে মুসলমানগণের সাথে বিজাতীয়দের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত কতিপয় যুদ্ধে, কিরূপে, কত দক্ষতার সাথে মুসলিমগণ জয়ী হয়েছেন তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এ নিবন্ধটিতে মুসলিম বীরগণ কিভাবে নিজস্ব শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে, অবলীলাক্রমে সংখ্যায় স্বল্প হয়েও জয়ী হয়ে এসেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম জাতির সেই ইতিহাস বর্ণনা করেন।[২] তিনি লিখেছেন– "এই সমস্ত যুদ্ধের কেবলমাত্র ফলাফলের মধ্যেই যে মুসলিমদিগের জাতীয় গৌরব নিহিত রহিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যেক যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মুসলমানগণ যে অপূর্ব বীর

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২. এই প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফা বদরের যুদ্ধ খ্রীস্টানদিগের সহিত যুদ্ধ, পারসিকদের সহিত যুদ্ধ ভারতীয়দের সহিত যুদ্ধ, পানি পথের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম শক্তি কিভাবে বীরত্বের সাথে জয়ি হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি অপর যে বিষয়টি এখানে তুলেধরেছেন তা হল বিপক্ষের তুলনায় মুসলিম সৈন্য সংখ্যা নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণই জয়ী হয়েছেন। যেমন- পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট ৫৩ হাজার আর মারাঠীদের সৈন্য ছিল তিন লক্ষেরও অধিক। এই বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন (গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০)

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবের ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাও নিতান্ত বিশ্বাসের বিষয়।এইখানেই মুসলিম জাতির শৌর্যবীর্যের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।"[১]

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে 'সত্যবার্তা' নামক একটি পত্রিকায় গোলাম মোস্তফার 'মোল্লা ও তরুণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবীণ ও তরুণদের দ্বন্দ্বের অবসান করার প্রয়াস চালান। এ প্রবন্ধে তিনি প্রবীণদের বলেছেন– "ওগো পুরাতন ওগো 'মোল্লা' এস; তোমাকে আলিঙ্গন করি। তুমি ঘৃণ্য নও, তুচ্ছ নয়; শ্রদ্ধানত মস্তকে তোমার দানকে আজ আমরা স্বীকার করি। জাতি জীবন–যুদ্ধে তুমিও একজন বীর মুজাহিদ। তোমার প্রয়োজন ছিল এখনও আছে।" [২] অন্যত্র তিনি তরুণদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন– "হে তরুণ! মনে রাখিও দূরন্ত চপলতা তোমার বাহিরের প্রকৃতি, কিন্তু তাপসের কৃচ্ছ্র সাধন তোমার অন্তরের মূর্তি। তোমার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, সে পথ অতি বন্ধুর, কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও সংযমের পথ দিয়া তোমাকে চলিতে হইবে। যে পথ দিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক মোহাম্মদ বিন– কাসেম মরুদরিয়া পার হইয়া সিন্ধু বিজয়ে আসিয়াছিল। যে পথ দিয়া কিশোর বাবর ভারত জয় করিয়াছিল। যে পথ দিয়া আজও তরুণ কাফেলা এভারেস্ট বিজয়ে চলিয়াছে, সেই তোমাদের চলার পথ।"[৩] এভাবে তিনি জাতীয় জীবনে প্রবীণ ও নবীনদের দ্বন্দ্ব নিরসন করতে চেয়েছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় গোলাম মোস্তফার 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' শিরোনামের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে কবি খুব সুচারুরূপে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। তিনি লিখেছেন– "কবি কল্পনা লইয়া থাকে, ইহাইত তাহার অপরাধ। কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে; কল্পনা না হইলে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাধনাও অচল হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ কল্পনা বলে একটা

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

থিওরী খাড়া করেন, পরে তাহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণা দ্বারা কল্পিত থিওরীটি সত্য প্রমাণিত হইলে তখনই তাহা বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিণত হয়। বস্তুত বৈজ্ঞানিকের জন্য কল্পনারও প্রয়োজন আছে।"[১]

গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধটিতে আরও লিখেছেন– "বৈজ্ঞানিক আসিয়া কবির কল্পনা পথ রুদ্ধ কারিয়া দাঁড়াইয়া; তাঁর সমস্ত স্বপ্ন সৌধ সে ভাঙিয়া দিতেছে। কবি এতদিন অবাধে আকাশে–ভবনে সর্বত্র বিহার করিয়া ফিরিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার সে সাধে বাধ সাধিয়াছে।প্রেয়সীর নয়ন–কোণে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া কবি মুক্তাবিন্দু জ্ঞানে সেগুলোকে প্রেম–সূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে যাইতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেই অশ্রুমালাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিল, উহা মুক্ত নহে– উহা দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মাত্র! কবি ফুল–বাগানে ফুলের মধ্যে ফুলরাণীকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং শানিত অস্ত্র দ্বারা ফুলের পাপড়ি গুলিকে কাটিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা শুরু করিল। নীশিথের অন্ধকারে পূর্ণ চাঁদ ও তারকা মন্ডলীকে দেখিয়া কবি নন্দন–কাননের শোভা দেখিতেছিল বৈজ্ঞানিক আসিয়া অমনি সেই চাঁদে গভীর খাত ও কঠিন পাহাড় আবিষ্কার করিল আর তারকামন্ডলীকে দেখিয়া এক একটা উপগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবিকে একদম বেকুফ বানাইয়া ছাড়িল।..... বৈজ্ঞানিক কল–কারখানার বিকট গর্জনে আজ কোকিল পাপিয়া দেশ ছাড়িয়াছে। আলোর নাচন স্তব্ধ হইয়াছে। সব সুর, সব ইঙ্গিত থামিয়া গিয়াছে। ..... কিন্তু প্রকৃতিও সহজপাত্রী নহে। বৈজ্ঞানিকের উপর সেও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে সেও প্লাবন, ভূমিকম্প, ঝটিকা ঘূর্ণিবার্তা ইত্যাদি মরণ–যন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকের সকল প্রয়াসে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। ..... তাই আমরা দেখিতে পাই যুগে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও এক একজন খ্যাতনামা কবিকে পাঠাইয়া দিয়াছে। টমসনের পাশে পোপ, নিউটনের পাশে মিলটন,

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

জগদীশ চন্দ্রের পাশে রবীন্দ্রনাথ এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এমনও ঘটিতেছে যে, কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই কবির জন্ম হইতেছে। ওমর খৈয়াম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির কি অপরূপ প্রতিশোধ।"[১]

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালে গোলাম মোস্তফা তার "কবি ও বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক প্রবন্ধটি সেই অধিবেশনে পাঠ করার পর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার গলার হার কবির গলায় পরিয়ে দেন।[২] এই প্রবন্ধের উপসংহারে গোলাম মোস্তফা বলেছিলেন– "মোটের উপর কবিতা বুঝিতে হইলে কবির মত হইয়া বুঝিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকের সার্চলাইট (Search Light) দ্বারা কবিতার সৌন্দর্য্য দেখিতে গেলে, সৌন্দর্য্য ধারা পড়িবে না,– উহাতে সৌন্দর্য্যের বিরূপ সাধন করা হইবে মাত্র। দূর হইতে কোন লাবণ্যময়ী রমণীয় মুখচ্ছবি দর্শনে আমরা বলিয়া উঠি– 'কি সুন্দর।' কিন্তু বৈজ্ঞানিক যদি সৌন্দর্য্য তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে যান। তবে সেই সৌন্দর্য্যের কিছুই তিনি দেখিতে পারিবেন না। তিনি দেখিবেন শুধু ত্বকের ভয়ানক ভঙ্গুর অবস্থা। সমস্ত মুখখানিকে ভাগ ভাগ করিয়া যদি বলা হয়– 'দেখ, 'নাসিকার এই স্থানটি কত সুন্দর? অধর কি সুন্দর? গণ্ডস্থল কি সুন্দর? ইত্যাদি'। তাহা হইলে আদৌ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।কবির কবিতাও ঠিক এই রূপ। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে সৌন্দর্যকে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্যকে দেখিতে হইলে সমষ্টির মধ্যে দেখিতে হইবে এবং দূরে থাকিয়া দেখিতে হইবে। তাই কোন কবি তাহার প্রেমাসম্পদের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন, যেহেতু "নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত–রেখা।"[৩]

---

১. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২
৩. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে সহজে অনুমেয় যে, গোলাম মোস্তফার যে কোন ব্যাপারে কত সুন্দর, কত সাবলীল ভঙ্গিমায় রচনা করতে পারতেন। তার চিন্তাশক্তি কত গতিশীল ও সময়োপযোগী ছিল। মুনির চৌধুরী তাই বলেছেন– "মানব কল্যাণ সাধনের সঙ্গে সৌন্দর্য্য প্রীতির মিলন সংঘটিত হয়; ধর্মানুপ্রেরণার সঙ্গে সামাজিক কান্ডজ্ঞান, মিশ্রিত থাকে; কাব্যানুভূতির সঙ্গে সতেজ রঙ্গ রস প্রিয়তার সমাবেশ ঘটে। লঘু–গুরুর এই মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণই পরিণত চরিত্রকে প্রাণ প্রিয় করে তোলে। স্বভাবের এই তারুণ্য মর্যাদাবান চিন্তার প্রকাশকে কতখানি দ্যুতিময় করে তার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত কবির একটি অতি পুরাতন রচনা "কবিও বৈজ্ঞানিক।"[১] তিনি আরো লিখেছেন, "পরবর্তীকালের যে সকল প্রবন্ধ তুলনামূলকভাবে অধিকতর তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহ সমৃদ্ধ সেখানেও গোলাম মোস্তফার ভাষা এক সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্য গদ্যরীতির কারুকলায় মন্ডিত।"[২]

"ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধ যা গোলাম মোস্তফা "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য" পত্রিকায় ১৯২২ সালে লিখেছেন। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্র নাথের রচনায় ইসলামের প্রভাব যে কতখানি তা তিনি সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তার যুক্তি দৃঢ় করার জন্য তিনি কুরআন হতে বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার সম্পাদককে লিখেছেন– "আপনার পত্রিকায় "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক লেখাটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি আমার মনে বিন্দুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখায় কোথাও কোথাও তা প্রকাশ পায়নি।"[৩]

---

১. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, মুসিলম রেনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ইং, পৃ. ৪৯

৩. গোলাম মোস্তফার ইসলাম ও কমিউনিজম গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও"রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ" নামক অপর একটি প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন। "ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ" নামক প্রবন্ধে এই দুই কবির দার্শনিকতা সম্পর্কে ইসলামের আলোকে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সমকালীন ও পূর্ববর্তী বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিকদের যেমন- নজরুল, মাইকেল মধুসুধন প্রমুখ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে "ইসলাম ও কমিউনিজম" গ্রন্থে তিনি অনেক মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন- "আমি অর্থনীতি বা রাজনীতির ছাত্র নই। ইউরোপে যতগুলো ষ্রব-এর সৃষ্টি হইয়াছে (যথাঃ Capitalism, Socialism, Nazism, Fascism ইত্যাদি) সেসব লইয়া আমি মথাও ঘামাই না। ও পথ আমার নয়। আশ্চর্যের বিষয়। তবু কিন্তু আমাকে কমিউনিজম সম্বন্ধে বই লিখতে হইল।"[১] বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকতা ও লেখালেখি ছাড়া তিনি যেহেতু কোন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না তাই তার এই অভিব্যক্তি।

"ইসলাম ও কমিউনিজম" বইটিতে তিনি ইসলামের ও কমিউনিজমের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন। কমিউনিজমের অসাড়তা ও ইসলামের সর্বকালব্যাপীতার বিষয়টি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে কমিউনিজমের সূত্রপাত হল সে বিষয়ে বলতে গিয়ে মধ্য ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে কমিউনিজম পর্যন্ত আসতে যে দুঃখ-দুর্দশা ইউরোপীয়ানরা ভোগ করেছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আর এর জন্য তিনি পুঁজিবাদ ও শ্রমবাদ, বৈষম্যবাদ ও সাম্যবাদ সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের অসাড়তার দিকগুলো সম্পর্কে। আর এ জন্য তিনি বিভিন্ন চিন্তাবিদদের বক্তব্য সংযোজন করে তার যুক্তিসমূহের অকাট্যতা প্রমাণ করেছেন।

---

১. গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও কমিউনিজম গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

কবি সাহিত্যিকগণ এই সমাজেরই মানুষ। তাই যে, কোন বিষয়ে তাদের অভিযোগ, অভাব প্রকাশ করতে হলে কলমের সাহায্যে লেখনীর মাধ্যমে করে। যদি তা না হত তবে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন না। বলাবাহুল্য নজরুল কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না ,ছিলেন লেখক আর তাঁর অনলবর্ষীয় লেখার মাধ্যমেই তিনি 'বিদ্রোহী' কবির মর্যাদা পেয়েছেন। 'ইসলাম ও কমিউনিজম' বইটি লেখার জন্য কবি যে বিষয়টি থেকে প্রেরণা লাভ করেন তা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন–"মুসলিম তরুণদের অনেকেই আজকাল কমিউনিজমের প্রতি বেশ খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইসলামী আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কমিউনিজমের রূপে ভুলিয়াছে। কমিউনিজমই হইল তাহাদের কাছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যেন দুনিয়ায় এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না, নাই, হইবে না। ইসলামের বিধান অপেক্ষা কমিউনিজমের বিধান যে শ্রেষ্ঠতর এবং বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধানে এই ব্যবস্থা যে সর্বাপেক্ষা উন্নত, ইহাই তাহাদের ধারণা, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্যই আমার প্রয়াস।"[১]

এছাড়াও তিনি কমিউনিজম বিষয়ে নিজকে "আনাড়ী লোক" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ গ্রন্থটির শেষে ৩২টি বই থেকে তিনি যে তথ্য পঞ্জীর তালিকা দিয়েছেন এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সাধনা ও পড়াশোনা চালিয়েছিলেন। ইসলাম ও কমিউনিজম প্রবন্ধটি ভাষা যুক্তি, ভাব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ধারায় বিন্যাস করা হয়েছে যে, এ বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞ –তা বলাটা অত্যুক্তি বা অযৌক্তিক হবে না।

গ্রন্থটির 'ইসলামের আলোকে কমিউনিজম' শিরোনামের পরিচ্ছদে গোলাম মোস্তফা বলেছেন যে– "কমিউনিজমের মূলনীতিগুলি ইসলাম হইতে গৃহীত । ইসলামই নূতন আন্দোলনের মূলে দিয়াছে প্রেরণা ও শক্তি। তবে জড়বাদী নাস্তিকদের হাতে পড়িয়া জিনিসটা যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা

১. গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও কমিউনিজম গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

বহুক্ষেত্রেই ইসলাম অনুমোদিত হয় নাই। একটি ভাল কাজ মন্দ উপায়ে করা হইয়াছে (Right thing done in a wrong way): এই জন্যই কমিউনিজমের সহিত ইসলামের সাদৃশ্য যেমন আছে পার্থক্যও ঠিক তেমিন আছে।"[১]

শাহাবুদ্দীন এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন– "এই বিষয়গুলোর আলোচনার মাধ্যমে গোলাম মোস্তফা কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সুদ প্রথার বিরুদ্ধতা বা সঞ্চয় পদ্ধতির স্বরূপের ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদের অভিশপ্ত ফল ইত্যাদির পাশাপাশি ইসলামের সুদপ্রথার বিরুদ্ধতা, জাকাত এবং সঞ্চয়ের প্রতি ইসলামের নিষেধাদির কথা উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, নতুন চিন্তার উদগাতা বলে কমিউনিজম চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিক আলোচনা রেখেছেন বলে প্রচার করেছে সেটা ইসলাম জ্ঞাত ব্যক্তির কাছে মোটেই নতুন কিছু নয়। এমনকি কমিউনিস্টদের মানবতাবাদ, আন্তর্জাতীয়তাবাদ বা নারী ও শ্রমিকের মর্যাদার প্রতি সমর্থন এর কোনটিই নতুন সৃষ্টি নয়।"[২]

কমিউনিজমের সহিত ইসলামের বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি "ইসলামের সহিত কমিউনিজমের পার্থক্য" শীর্ষক শিরোনামে গোলাম মোস্তফা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কমিউনিজম আল্লাহ ও ধর্মের বিরাধী। ইহা তিনি প্রমাণ করেছেন লেনিন লিখিত Religion গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে। লেনিনের মতে "Aetheism is a national and insaparable part of Mansism. Mansim cannot be conceive without aetheism" (অর্থাৎ নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিক ছাড়া মার্কসবাদ কিছুতেই বুঝা যাইতে পারে না) লেনিন লিখিত অপর একটি উক্তিতে আছে– Down with Religion! Long live Aethei sm. The dessimination of Aetheist views is own chief task" (Religion P.17) অর্থাৎ ধ্বংস কর ধর্মকে, দীর্ঘজীবী হউক নাস্তিকতা, নাস্তিকতার প্রচারই আমাদের প্রধান কর্তব্য।" এই বইয়ের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ The Marxist must be a materialist. i.e.. an enemy of

১. গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও কমিউনিজম, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮ইং পৃ. ৫৮

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

Religion. (Religion by lenin p. 21) অর্থাৎ মার্কসবাদী হইতে হইলে তাহাকে জড়বাদী হইতে হইবে।"[১]

এরপর গোলাম মোস্তফা ইসলামের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এভাবে– "ইসলামের মূলমন্ত্র হইল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই– মোহাম্মদ তার প্রেরিত রসূল।" ইহাই ইসলামের শিক্ষা। কাজেই আল্লাহকে বাদ দিয়া বা ধর্মকে বর্জন করিয়া তাহার কোন কাজই সম্ভব নয়। ভিত্তিহীন সৌধের মতই সে হয় একটা অন্তসারশূন্য মিথ্যা বস্তু। কমিউনিজমের ব্যাপক অনুষ্ঠান দেখিলে তাই মনে হয় যে, এ যেন মস্তকহীন একটা বিরাটকায় জন্তু– যার হাত, পা, জবান সবই কাজ করিতেছে। কিন্তু সব কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন, এলোমেলো।"[২]

"ইসলাম ও কমিউনিজম"গ্রন্থে গোলাম মোস্তফা "কমিউনিজম কি বাঁচিয়া আছে" শিরোনামে যে পরিচ্ছদটি রচনা করেছিলেন তার বিষয়বস্তু আজ সর্বজনবিদিত। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, মানব রচিত যে কোন জিনিস তা কখনোই আল্লাহর তৈরি ইসলামের সার্বজনীনতা, সর্বকালব্যাপিতা। এর সাথে তুলনা হতে পারে না। "কাজেই অর্ধশতকেরও আগে গোলাম মোস্তফা যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে তা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। সেদিন সুদূর নয়, যেদিন বিভ্রান্ত নিরীশ্বরবাদীরা আবার আল্লাহর একত্ববাদে ফিরে আসবে। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আবার গগন–পবন মুখরিত হয়ে উঠবে।"[৩]

"ইসলাম ও কমিউনিজম" বইটি সম্পর্কে গোলাম মোস্তফার বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতার ক্ষমতাকে উদ্দেশ্য করে শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন– "তিনি তার ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজজ্ঞান সম্বন্ধে তার যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তার ইসলাম ও কমিউনিজম সম্পর্কে যে দার্শনিক বোধ ও উপলব্ধি প্রজ্ঞা ও সজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রমাণ করেছেন তার মনীষার ব্যাপৃতি,

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৪-৮৫
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৩. ড. খালেদ মাসুকে রাসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

দীপ্তি ও গভীরতা মনীষা সৃষ্টির উপযোগী। সাধারণ অর্থে যাদের গবেষক বলা হয় সেই অনুকূল স্রোত–সৃষ্ট গবেষকদের আসনের ঊর্ধ্বে তার স্থান।"[১]

পুঁজিবাদ সম্পর্কিত গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত মতামত 'অর্থনীতিক প্রণালী [Economic System] হিসেবে পুঁজিবাদ অতি চমৎকার ব্যবস্থা।"[২]এ সম্পর্কে শাহাবুদ্দীন আহমদ দ্বিমত পোষণ করে লিখেছেন– "পুঁজিবাদের সঙ্গে সুদবাদও জড়িত। ইসলাম সুদকে ভীষণভাবে পরিতাজ্য বিষয় বলে মনে করে। সুতরাং তার পক্ষে পুঁজিবাদকে চমৎকার ব্যবস্থা বলা সম্ভব নয়।"[৩] গোলাম মোস্তফা বইটির অন্যত্র ইসলাম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন–

"I Imperialism

S Socialism

L Liberalism

A Allaism

M Materialism"[৪]

এ উদাহরণটি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন সব ইজম নিয়ে ইসলাম গঠিত। এ সম্পর্কে শাহাবুদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেছেন– "এ উদাহরণ দিয়ে 'সব ইজম লয়ে' ইসলাম গঠিত বলে যে অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে তার মানস শিশুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। Imperaliasm বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে Materialism বা বস্তবাদের সঙ্গে ইসলামের সামান্যতম মিল নেই। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ অর্থে যে Imperialism কে বুঝি বা Materialism অর্থে আমরা যে বস্তুবাদ বা জড়বাদকে বুঝি তার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। একটির মধ্যে লুণ্ঠনকারী শোষকের রূপ,

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক) প্রাগুক্ত পৃ. ৮৩

২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৭

৩. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

নৃশংসতা ও নিপীড়নকারী দুঃশাসনের রূপ, অন্যটির মধ্যে আছে নিরিশ্বরবাদী আস্তিক্যবাদের অবিশ্বাসবাদের রূপ। এই মিশ্রিত উপাদানকে ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করতে অপারগ।"[১]

গোলাম মোস্তফা ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনে ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন– "ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয় প্রয়াসী তখন ইসলামী সাহিত্য কেন হবে সংকীর্ণ ও অনুদার? ইসলামী কোন জিনিসই তো সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক, ধর্মই হোক, সমাজই হোক, শিল্পেই হোক ইসলাম সর্বত্রই মিলেছে এবং মিলিয়েছে। খন্ডতা ও ক্ষুদ্রতার স্বপ্ন যেখাইে ভীড় জমিয়েছে সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের জন্য স্থান সংকুলান করাই তো ইসলামের কাজ। নিজেও থাকবে, অপরকেও থাকতে দেবে। এই Co-existence-ই হলো তার নীতি। ইসলামের সহনশীলতা অনন্য সাধারণ। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সে স্বীকার করে, ভিন্ন ধর্মের পয়গম্বরদিগকে সে মানে। ইসলামের ধাতুগতঅর্থই হলো আপোস বা মিলন। দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের মধ্যে সে ধর্ম ও কর্মের মধ্যেও সে ঘটিয়েছে অপূর্ব মিলন। ইসলামে জাতি ভেদ নাই। সাদা–কালো বাদশাহ, ফকির, কাফ্রী, ইরানী, আফগানিস্তান, তুরানী, আরবী, হিন্দুস্থানী– সব এক করে দিয়ে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী সে রচনা করেছে। বিশ্বমানবাত্মা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন তার চোখে।"[২]

গোলাম মোস্তফা ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে আজীবন সাধনা করে গেছেন। ১৯২৭ সালের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় গোলাম মোস্তফা মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য নামক প্রবন্ধে ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরে লিখেছিলেন– 'সংস্কার, সংরক্ষণ সমন্বয় ও সংযোজন এই কয়টিই হইল মুসলিম কালচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি থাকিবে।[৩] প্রবন্ধটিতে তিনি Culture-এর যেভাবে ইসলামী স্বরূপ

১. গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও কমিউনিজম, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮৮ইং, পৃ. ৯৭
২. গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১৯৬২ইং, পৃ. ১৭৩-৭৪
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে পরিচ্ছন্নতার অবয়বে নতুন করা হয়। মূলতঃ ইসলাম যে সংস্কৃতিকে স্বীকার করে তা অবশ্যই আল্লাহর একত্ববাদের আলোকে আলোকিত হতে হবে।

গোলাম মোস্তফা জ্ঞান সাধনার প্রতি সবসময়ই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দীন ও দুনিয়ার জ্ঞান চর্চার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করে উল্লেখ করেন— "দীন ও দুনিয়া" দুইটিই যে আমাদের কাম্য, একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে অবলম্বন করা যে ন্যায়সঙ্গত নহে, কুরআন-হাদীসের এই শিক্ষাই মুসলমানদিগের সমগ্র জ্ঞান সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।"[১]

আদর্শবাদী লেখক হিসেবে গোলাম মোস্তফা ছিলেন সুবিখ্যাত। তাঁর গদ্য রচনার বিশিষ্টভঙ্গী, কাব্যময় বাক্য বিন্যাস সহজেই পাঠক হৃদয়কে বিমুগ্ধ করে। গভীর চিন্তা তর্ক ও ধারালো যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেছেন চারু গদ্যের অভ্যস্ত বিন্যাসে। আবুল ফজল এই সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন "তার গদ্য প্রাঞ্জল, গতিশীল আর সুখপাঠ্য। ভাষার কোথাও এতটুকু জটিলতা নেই।"[২]

কাদের নেওয়াজ এই সম্পর্কে বলেছেন, "মিলটনের এরিও-পেজেটিকার গদ্য যেমন জ্ঞান স্পৃহা বাড়িয়ে তোলে গোলাম মোস্তফার গদ্য রচনাও তাই।"[৩] আজহারুল ইসলাম লিখেছেন "কবি গোলাম মোস্তফার গদ্য রচনার সাথে যারা পরিচিত তারা স্বীকার করবেন যে তার লেখনী যেমন কাব্য সুষমায় শ্রীমন্ডিত। তেমনি প্রাঞ্জল ও ব্যঞ্জনাময়। তার সকল গদ্য রচনাই হয়েছে সরল ও হৃদয়গ্রাহী। তার বহু চিন্তাতর্ক ও যুক্তি জাল বিস্তৃত হয়েছে মনোহর গদ্যে। আদর্শবাদী লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন সাহিত্য সমাজে সুবিদিত। তার মহৎভাব ও ভাবনাগুলো যেমন ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তেমনি বিচিত্র ও কোমল মধুর গদ্য ভঙ্গীতে প্রাণ পেয়ে উঠেছে। কালচার্ড অর্থাৎ পাঠশীলিতমনা লেখকদের একটা বড়গুণ হচ্ছে প্রাঞ্জল রচনারীতির অধিকারী হওয়া আমাদের প্রিয় কবি সেই গুণের অধিকারী ছিলেন।"[৪]

---

১. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৯৭ইং, পৃ. ৭৩
২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ সংখ্যা, এপ্রিল-মে-জুন, ৯৮ইং সংখ্যা, পৃ. ১৪৫
৩. ফিরোজা খাতুন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা-১৯৬৭ইং, পৃ. ৬২
৪. ফিরোজা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী রচনায় ইসলামী প্রেরণা

গোলাম মোস্তফা ইসলামের প্রতি অনুরাগী একজন সত্যিকার মুসলিম ছিলেন। তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মহানবী (সঃ) এর আদর্শের একান্ত অনুসারী ছিলেন। আর তাই ইসলামী আদর্শ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রসংঙ্গে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অসংখ্য গান, কবিতা ও গদ্যরচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচিত বিশ্বনবী অনুপম কাব্যময় গদ্যস্বরূপ এক অনন্য রচনা। বাংলাভাষাতে অনেকেই মহানবী (সঃ) এর জীবন চরিত রচনা করেছেন, কিন্তু বিশ্বনবীর ন্যায় এত জনপ্রিয়তা অন্যকোন গ্রন্থই লাভ করতে পারেনি। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত ৫৬ বছরে বইটির মোট ২৮টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[১] অর্থাৎ প্রকাশককে প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর একটি করে সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশ করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে নাসির হেলাল বর্ননা করেছেন– "আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কবি গোলাম মোস্তফা যদি বিশ্বনবী গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কিছু রচনা নাও করতেন তবুও যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙ্গালী পাঠক তথা মুসলিম পাঠকের কাছে বেঁচে থাকতেন এবং শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকতেন।"[২]

ইসলামী ভীতের উপর দাঁড়িয়েও যে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় তার উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' । বাংলা সীরাত সাহিত্যেতো বটেই মহাপুরুষদের জীবনী রচনার ক্ষেত্রেও এটি হচ্ছে জনপ্রিয়তার রেকর্ডমান উন্নীত গ্রন্থ।[৩] গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী লিখার পেছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করেছে এ সর্ম্পকে তিনি মন্তব্য করেছেন যে –"বিশ্বনবী কেন লিখলাম ,কোন প্রেরণা আমাকে রাসূলুল্লাহর জীবনী লিখতে উদ্বুদ্ধ করলো, তা 'বিশ্বনবী ' তেই প্রকট হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনের

১. দ্রষ্টব্য ঃ গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮ ইং

২. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী ঢাকা–১৯৯৮ইং, পৃ. ৫৮

৩. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল–আযহারী, 'বিস্মৃত উপেক্ষিত কবি গোলাম মোস্তফা 'ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

বহু সৌন্দর্য্য ও চরিত্র-মাধুর্য্য মামুলি তত্ত্বকথার চাপে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। নূতন যুগের নূতন আলোকে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাসূলুল্লাহ্‌র জীবন ও ধর্মাদর্শ কেমন দেখায়, যুগমনের জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের কতোটুকু তিনি জবাব দিতে পারেন বর্তমান জগতে তাঁর শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার কোন কার্যকরী অবদান আছে কিনা এবং ভবিষ্যতের জন্যই বা সে কি পথ নির্দেশ করেছে-এ সব সমস্যার উপর আলোকপাত করাই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য । অতি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শকে বিচার করা হয়েছে। সেখানে ও তাঁকে দেখতে পেয়েছি আমরা অত্যুজ্জ্বল মহিমার বেশে।"[১]

বিশ্বনবী গোলাম মোস্তফার একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি রচনা করতে তিনি ৬২ টি বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুক্তি ইত্যাদি বিভিন্নভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গ্রন্থটি একটি অনবদ্য রচনারূপে প্রকাশ করেছেন। "বিশ্বনবী গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফা প্রকৃত প্রস্তুতি নিয়েই অগ্রসর হন। বিশ্বনবীর ওপর একটি প্রামাণ্য বই রচনার ক্ষেত্রে বিপুল প্রস্তুতি ও পড়াশোনার প্রয়োজন সে সর্ম্পকে তিনি সচেতন ছিলেন। বিশ্বনবী রচনার সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য তেষট্টিটি গ্রন্থের সহায়তা নেন। এগুলোর অধিকাংশই ইংরেজী গ্রন্থ। ইংরেজী ছাড়াও তিনি বাংলা, আরবী ও উর্দূতে প্রকাশিত প্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তা গ্রহন করেন।"[২]

বিশ্বনবী লেখার জন্য তিনি মহানবীর সীরাত বিষয়ক অনেক বই পড়েছেন কিন্তু আশেকে রাসূল হিসেবে কাউকেই দেখতে পাননি। গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী'র 'আরজ' এ লিখেছিলেন-"হযরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবী, উর্দূ, বাংলা বহুগ্রন্থই দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু সেইগুলির মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি। অনুভূতির আবেদন (Emotional Appel) খুব কম গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ

১. সম্পাদনা মাহফুজা খাতুন, গোলাম মোস্তফাঃ প্রবন্ধ সংকলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস- ঢাকা-১৯৬৮ইং, পৃ. ২১৯

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যা, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

লেখকই হযরতের জীবনের সৌন্দর্য্য লোকে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষদের জীবন শুধু ঘটনার ফিরিস্তি নহে;শুধু যুক্তি তর্কের কন্টক পর্যাপ্ত নহে ; সে একটা ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু ; তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে সত্যের আলোকে ও বিজ্ঞানের বিচার বুদ্ধি অপর দিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি আর চাই প্রেমিকের প্রেম।"[১]

"পরিকল্পনার অভিনবত্বই বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য ' এ কথা সঠিক শুধু বর্ণনাধর্মী রসূল জীবনী রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। রসূল (সঃ) এর সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলছিল বিশ্বময় 'বিশ্বনবীতে তার উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানধর্মী যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। এজন্য আর্টসের ছাত্র হয়েও (গোলাম মোস্তফা আর্টসের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন) তিনি বিজ্ঞান পড়েছিলেন।"[২]

বিশ্বনবী মূলতঃ একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ ধর্মী লেখা। গোলাম মোস্তফা সত্যসন্ধানী গবেষকের ন্যায় সুচারু রূপে যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের সত্যতা তুলে ধরেছেন। তিনি এ সর্ম্পকে মন্তব্য করেছেন– "বিজ্ঞানের টর্চ লাইট হাতে করিয়াই হজরতের জীবনকে তন্ন তন্ন করিয়া

---

১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, 'গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য' অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ইং, পৃ. ৭২

২. তিনি বিশ্বনবী রচনার জন্য পড়েছিলেন স্যার জেমস্ জীনসের The Mystious Universe. The Universe Around Us. The New Background of Science. The Growth of Physical Sciences. Limitation of Science. ডব্লিউ এন সুলিভাবের Bases of Modern Sciences. Limitation of Science. ডব্লিউ আর্থার এডিংটনের The Expanding Universie. The Nature of the the physical world. এ.এন. হোয়াট হেডের Science and the Modern world: আলবার্ট আইনষ্টাইনের The Theory of Relativity: বার্টান্ড রাসেলের The A.B.C of Relativity' ইন্সোসনের Easy Lessons on Einestion: আইভার এল টাকেটের Evidence of Supernatural: আর্থার সি. ক্লার্কের The Exploration of space' হ্যারল্ড লিপ্যান্ড গুড উইলের Space Travel: জর্জ গ্যামোর One .Two. Three: Infinity: বার্নার্ড বেনেট রাইসের New Hand bookof the Heavens: জে,এন,লিওল্যান্ডের Flight into space : ডন ব্রন এন্ড হুইপনের Man on the Moon: [অগ্রপথিক–ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯৭ইং, পৃ. ৭৪ দ্রষ্টব্য]

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়াছি' ; 'দর্শন–বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির বিকৃত ধারণাকে আমি দূর করতে চেষ্টা করিয়াছি।"[১]

এ প্রসংঙ্গে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ রচিত প্রবন্ধ "কাব্যধর্মী রচনা 'বিশ্বনবী'" তে উল্লেখ করেছেন–"গোলাম মোস্তফার "বিশ্বনবী " (১৯৪২) একটা উল্লেখ যোগ্য গদ্যগ্রন্থ । গ্রন্থটি উল্লেখ যোগ্য দ্বিবিধ কারণে প্রথমত এর সুললিত ভাষাভঙ্গি এবং দ্বিতীয়ত এর গবেষণা ধর্মী বিষয়বস্তু । ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবনী ও ইসলাম ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি ধর্মের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু কাব্য ধর্মী ভাষায় লিখিত হওয়ার জন্যে 'বিশ্বনবী ' বিষয়বস্তু ও ভাষার জন্যে বিপুল পাঠক সমাদৃত হয়। "বিশ্বনবী" কবির শ্রেষ্ঠতম গদ্য রচনা হিসেবে স্বীকৃত।"[২]

মি'রাজ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা খন্ডনে গোলাম মোস্তফা বিশ্বনবী তে লিখেছেন–"আজ আমরা এক নূতন বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া পৌছিয়াছি। এই যুগে নভোভ্রমণের (Space Flight) যুগ । রকেট–শিপে চড়িয়া বৈজ্ঞানিকরা আজ গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। এই নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের আগ্রপথিকরূপে আমরা দেখিতে পাই হযরত মোহাম্মদকে। পৌরানিক কাহিনী নহে, কিংবদন্তী নহে–ঐতিহাসিক সত্যরূপেই সশরীরে তিনি মি'রাজ করিয়াছিলেন, আজকার নভোভ্রমণ সেই মি' রাজেরই প্রেরণাদীপ্ত বৈজ্ঞানিকরূপ, কাজেই বলা যাইতে পারে, এ যুগের পূর্বাভাস রসূলুল্লাহ্ই জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন। অন্য কথায় তিনিই ছিলেন প্রথম নভো–বৈমানিক।"[৩]

গোলাম মোস্তফা তাঁর গ্রন্থের 'আরজ' এ মোজেজা ও মি'রাজ সম্পর্কে লিখেছেন–"বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকেও তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছি। বিজ্ঞান জুজুর ভয়ে আজকাল বহু যুক্তিবাদী লেখক হযরতের জীবনী হইতে বহু মূল্যবান ঘটনাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিয়া শুধু মানবতার পটভূমিতে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছেন। হযরতের বক্ষ বিদারন, মি'রাজ, মোজেজা

১. অগ্রপথিক–ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ ইং পৃ. ৭৩

২. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, প্রেক্ষণ, এপ্রিল –জুন–৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৮৫

৩. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস–ঢাকা–১৯৯৮ ইং, পৃ. ৪০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি সম্বন্ধে তাই তাঁহাদের গ্রন্থে বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তাহা করি নাই।"[১]

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বহু বিবাহ নিয়ে আজ অবধি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানা রকম অপপ্রচারণা রয়েছে। গোলাম মোস্তফা বিশ্বনবী গ্রন্থে অতন্ত্য সূক্ষ্ম বিচারকরূপে চুল চেরা বিশ্লেষণ করে এ বিষয়টি সর্ম্পকে লিখেছেন–"হযরতের বহু বিবাহের মধ্যে লাম্পট্য নাই, কাপট্য নাই। এক সুমহান আদর্শ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। নিছক মানব কল্যানের প্রেরণা তাগিদেই তাঁহাকে অসময়ে এতগুলি বিবাহ করিতে হইয়াছিল, অন্যকোন উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ছিলনা।" [২] যুক্তি জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, পূর্বাপর সকলের চেয়ে রসূল (সঃ) ই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা পরিপূর্ণ (Perfect)। রাসূল (সঃ) তাঁর সমগ্র জীবনে শত প্রতিকুলতার মধ্যে সংগ্রাম চেষ্টা, সাধনা দ্বারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর অলৌকিক গুণাবলী, মানবতাবোধ সব মিলিয়ে তিনি অতিমানব। তিনি সাধারন মানুষ ছিলেন শয়তান তাঁর প্রকাশ্য শত্রু ছিল এ সবের মোকাবিলায় তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সবই একজন সাধারণ মানুষের জীবনের জন্যেও তা উপযোগী। এ পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ এসেছেন তাঁদের কারো সাথে যদি কেউ রসূল (সঃ) এর তুলনা মূলক আলোচনা করে পরীক্ষা করতে চান যে, কে শ্রেষ্ঠ? এর জন্য গোলাম মোস্তফা ২১টি[৩] বিচার বিন্দু ঠিক করে দিয়েছেন এবং এর সাহায্যে তিনি গৌতম বুদ্ধ ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর তুলনামূলক আলোচনা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন– মুহাম্মদ (সঃ) সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন"।[৪]

---

১. অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই–১৯৯৭ইং, পৃ.৭৪

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা–১৯৯৮ ইং পৃ.৪০৩

৩. ২১ টি বিচার বিন্দুর জন্য 'বিশ্বনবী', পৃ.৩৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪. অমুসলিমদের দৃষ্টিতে গোলাম মোস্তফার বক্তব্যকে, Critical analysis নয় Critical appreciation বলে মনে করা হবে। কিন্তু তাঁর আলোচনা Critical appreciation কে অযৌক্তিক বলে উপেক্ষা করা কঠিন। তার আলোচনা Comparative বা তুলনা মূলক আলোচনা । আর তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে যাদের সঙ্গে যে তুলনা করতে হবে তাদেরও নাড়ী–নক্ষত্র জেনে তা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি মোস্তফা কামাল তাঁর "বহুমূখী প্রতিভার কবি গোলাম মোস্তফা "প্রবন্ধে লিখেছেন–"তাঁর লেখা হযরত রসূলে করীম (সঃ) কাব্যিক ও বিশ্লেষণ ধর্মী জীবনী গ্রন্থ "বিশ্বনবী" বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থগুলোর একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।"[১] গোলাম মোস্তফার "বিশ্বনবী'তে যে ভাষা উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা করেছেন তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ইহা তাঁর অমরকীর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। ইহা একটি অতুলনীয় রচনা। মুনশী আবদুল মান্নান এ সর্ম্পকে মন্তব্য করেছেন–"গোলাম মোস্তফার গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বিশ্বনবী 'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সমালোচকগণ বিশ্বনবীকে তাঁর সাহিত্য সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সফল প্রতিভার অক্ষয় কীর্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাংলা ভাষায় রচিত মহানবী (সঃ)–জীবনী গ্রন্থ গুলোর মধ্যে এটি এখন ও শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। বিশ্বনবীর ভাষাকে আধুনিক বাংলা ভাষার এক অত্যুৎকৃষ্ট নির্দশন হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।"[২]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'বিশ্বনবী' সর্ম্পকে বলেছেন–"গোলাম মোস্তফা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতার দেখা দিয়েছে বিশ্বনবী নামক আল্লাহ্‌র রসুলের (সঃ) জীবন চরিত লেখায় । এতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক মোস্তফা হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) এর মি'রাজকে অস্বীকার করে যে সব উক্তি করা হয়েছে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। এতে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্রয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে বাংলা ইংরেজী বা অন্যান্য ভাষায় যে সব গ্রন্থ এ যাবত লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এ গ্রন্থ খানা শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হয়েছে।"[৩] গোলাম মোস্তফা শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শকেই তুলে ধরেননি, বরং তাঁর জীবন সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বিশ্বনবী সর্ম্পকে মন্তব্য করে বলেন– "মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁহার নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলা

১. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত,প্রেক্ষন, এপ্রিল –জুন–৯৮ সংখ্যা–পৃ. ৬৮
২. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, প্রাগুক্ত –পৃ–৩৯
৩. সম্পাদক হাসান আবদুল কাইয়ূম, ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বার'৯৭ সংখ্যা –পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

বাহুল্য, ইহা 'বিশ্বনবী , হযরত মুহাম্মদের (দঃ) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী জীবন চরিত্র। এই গ্রন্থাকার হযরত সম্পর্কে তাঁহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষনার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক খানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা,তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।"[১]

মুহাম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত "নামক গ্রন্থে লিখেছেন –"গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী (১৯৪২) হযরত মুহাম্মদের জীবনী এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্পর্কে এ শতাব্দিতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটি অত্যন্ত সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। গোলাম মোস্তফা কবি। 'বিশ্বনবী'তে তাঁর কবি মনের প্রকাশ সুস্পষ্ট এবং রচনাও আবেগ প্রণোদিত । 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"[২]

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলা জনাব মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেব মন্তব্য করেছেন এ ভাবে–"কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের লিখিত হুজুরের (সঃ) জীবনী 'বিশ্বনবী' পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। উহার ভাব, ভাষা, দার্শনিকতা কোরআন ও হাদিস শরীফ এবং তাছাউফের সম্পূর্ণ অনুকূল ও ছুন্নাতুল জামায়েতের আকায়েক মোয়াফক। যাঁহারা বাংলা ভাষায় হযরত রসূলে করিমের (সঃ) সঠিক জীবনী ও সত্যস্বরূপ জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে বিশ্বনবী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" [৩]

শ্রীযুক্ত মনোজবসু বলেছেন– "আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। মহামানুষেরা সর্বকাল ও সর্বদেশের সম্পত্তি । ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক সময়েই নিখিল নর–নারীর নিকট থেকে

১. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা–১৯৯৮ ইং, পৃ.৪৩১
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩১
৩. মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়ীদ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা–পৃ.১২৫

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু মহানবীর পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত লিখিবার সময় আপনার কবি ধর্ম সর্বদা আপনাকে গন্ডিসঙ্কীর্ণ তার উর্ধ্বে রেখেছে। আমিও আমার মত আরও অনেক ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌছবার এই সেতু রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য –কীর্তি । ভাষা কবিত্ব ঝংকার ও ভাব লালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে। এই অনন্য অবদানের জন্য সাহিত্যসেবী হিসেবে আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"[১]

সৈয়দ আলী আহসান এ সর্ম্পকে বলেন,"বাংলা সীরাৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অন্য কোনটির ভাগ্যে তা হয়নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপূণ বাকশিল্পী কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ন ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামন্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তি প্রবণ বাঙালী অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধবনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনা বিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।"[২]

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ বলেন–"বিশ্বনবীর জীবনী রচনায় গোলাম মোস্তফা স্বতন্ত্র মুসলিম দৃষ্টি কোন থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন।"[৩]

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এ সর্ম্পকে বলেন–"কবি গোলাম মোস্তফা রচিত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রামান্য জীবনীগ্রন্থ "বিশ্বনবী"। এই গ্রন্থখানা সাধারণ পাঠক এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করে ।"[৪]

---

১. গোলাম মোস্তফা ,প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩১

২. মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ইং, পৃ.৩২–৩৩

৩. মাহফুজ উল্লাহ, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, নিউ মার্কেট, ১৯৬৫ –পৃ. ১১১

৪. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা –১৯৮৫ইং, পৃ. ১৪৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে "বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম।"[১] এম,ইয়াসিনের মতে, "কবি গোলাম মোস্তফা রচিত ধর্ম পুস্তক সমূহের মধ্যে 'বিশ্বনবী' একটি অমূল্য গ্রন্থ। বস্তুতঃবাংলা ভাষায় ইহার সমকক্ষ অন্য কোন হজরত মোহাম্মদ (সঃ)'র প্রামাণ্য জীবনী অদ্যবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রতিভার মাহাত্ম্যই এই যে, সে যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে এবং তাই কবির প্রতিভার সংস্পর্শে রাসূলুল্লাহর (সঃ) জীবনী রচনা পরিপূর্ণ স্বার্থক হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের নিকট অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হয়।"[২]

মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী বলেন–"বিশ্বনবী"গদ্য সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবনী পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা শুধু তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় বহন করে না, ভক্তের আবেগ ও গবেষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমন্বয়ে প্রকাশ ভঙ্গির স্পষ্টতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা দিয়ে যা তিনি সৃষ্টি করলেন তা বাংলা ভাষায় বিরল।"[৩] গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' পাঠ করে অনেক বিধর্মী ও মুসলমানস ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

আজও তাই গ্রন্থটি সকলের নিকট সমাদৃত আছে এবং থাকবে। তিনিও সকলের নিকট আজীবন স্মরণীয় থাকবেন। তাঁর এই অমর কীর্তির জন্য যুগে যুগে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। বিশেষ করে মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ যে মানব ইতিহাসের সুন্দরতম আদর্শ তা তিনি অপূর্ব নৈপূণ্য ও গবেষণার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ ছাড়া ও তিনি বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য নামক অপর একটি বই লিখেছেন। এ বইটিতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন মূল্যবান

---

১. মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৫ইং, পৃ. ৩২৮

২. সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ পৃ.১৩২

৩. মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী, বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, প্রকাশক অধ্যাপিকা শামসুন নাহার লিনি, বারান্দী পাড়া, কদম তলা , যশোর,১৯৮৭ ইং, পৃ.১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় সমূহকে তুলে ধরেছেন। তিনি এ সর্ম্পকে বইটি ভুমিকাতে উল্লেখ করেছেন যে," এই প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, 'রসূল ' (Apostle) শুধু একজন ছিলেন–তিনি হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ। অন্যান্য পয়গম্বরেরাও 'রসূল'ছিলেন বটে ; কিন্তু সেখানকার 'রসূলের' অর্থ হইতেছে 'কাসেদ' বা সংবাদবাহক (Massenger)। 'লাই লাহা ইল্লালাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্"এই মূল কলেমায় আল্লাহ যে অর্থে মুহাম্মদকে 'রসূল' বলিতেছেন সেই অর্থে অন্যান্য পয়গম্বরকে তিনি রসূল বলেন নাই। ইহাই আমার বক্তব্য। অবশ্য বিষয়টিতে প্রচুর মতভেদের অবকাশ আছে।"[১]

কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী সাহিত্য বিচারে যে কত উঁচু পর্যায়ের মূল্যমানের ছিল বিখ্যাত মনীষীদের সে সম্পর্কে অসাধারণ উক্তিই তা প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে কবি কন্যা ফিরোজা খাতুন লিখেছেন–"কবির নিজ গ্রাম মনোহর পুরে কবি গোলাম মোস্তফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ সাহেব ও দেওয়ান আবদুল হামিদ সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিলেন।ফেরার পথে কুষ্টিয়ার লাইব্রেরীর আমন্ত্রণে কবি গোলাম মোস্তফার জম্মদিন উপলক্ষে এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে আমরা তিন ভাই বোন আমি, মোস্তফা আজিজ এবং রশিদা হকও উপস্থিত ছিলাম। সেই মিটিং এ ৫ জন লোক এসে আমাদের ভক্তি ভরে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললো ঃ আমরা কয়েক বছর আগে 'বিশ্বনবী' পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমাদের পরিবারবর্গ সকলেই কবি গোলাম মোস্তফাকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের নেই । তাই তাঁর সন্তানদের দেখতে আমরা এসেছি। আপনাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। আজরফ চাচা,আবদুল হামিদ ভাই, আমার ভাই বোন এবং সভার সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।"[২]

কবি কন্যা আরো বলেন–"আমি ডি.আই.টি. তে গিয়েছি বাড়ীর প্লান পাশ করতে। যার কাছে গিয়েছিলাম তিনি টেবিলে না থাকায় পাশের টেবিলের লোককে বললাম, উনি আসলে বলবেন কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের মেয়ে এসেছিলেন । শুনামাত্র তিনি এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে

১. গোলাম মোস্তফা –বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য ,আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৯৭ (১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা) পৃ.১০৮

Dhaka University Institutional Repository

সালাম করে চেয়ার টেনে বসতে দিয়ে বললেন, বহুদিনের সাধ আজ আমার পূরণ হলো । আমি লালবাগ মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হল আপনারা চলে যাবেন না। কবি গোলাম মোস্তফার মাধ্যমে দু'জন লোক ইসলাম গ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছেন কবি সাহেব। ঘটনা হচ্ছে –কবি গোলাম মোস্তফার বাড়িতে দু'জন হিন্দু লোক এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। কবি সাহেব বললেন, আমি ধর্মবেত্তা নই, মওলানাও নই। সাধারন একজন লেখক ভক্তি ভরে বইটা লিখেছি। সেই বই পড়ে যদি আপনাদের ভক্তির উদ্রেক হয়েছে এটা আমার সার্থকতা। আপনাদের যখন এতই আগ্রহ তা হলে চলেন লালবাগের মসজিদে । তাই লালবাগ মসজিদেই তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হল। সমস্ত মসজিদের সকলকে কবি সাহেব মিষ্টি খাওয়ালেন।"[১]

গোলাম মোস্তফার লিখা 'মরু দুলাল' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এক সময় দ্রুত পঠন হিসেবে স্কুল সমূহে পাঠ্য ছিল। 'মরু দুলাল' সর্ম্পকে গোলাম মোস্তফা নিজে বইটির ভূমিকায় লিখেছেন –"মরু দুলাল নূতন বই নয়। 'বিশ্বনবী'রই ইহা একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। 'বিশ্বনবীর' দ্বিতীয় খন্ডে হজরতের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে 'মরু দুলালে' তাহা নাই। হজরতের জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া 'মরু দুলাল' রচিত হয়েছে। 'বিশ্বনবী'র আকার বৃহৎ মূল্যও বেশী । তরুনমতি ছাত্র সমাজ বা সাধারন পাঠকের পক্ষে সে গ্রন্থ পাঠ করা বা আয়ত্ব করা সর্বত্র সম্ভব নয়। এই কারণে অনেকেই ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহারই ফল এই 'মরু দুলাল'।"[২]

তিনি 'মরু দুলাল' গ্রন্থের ভূমিকায় আরও লিখেছেন –'মরু দুলাল ' সর্বসাধারণ পাঠকের উপযোগী হইলে ও বিশেষ করিয়া ছাত্র সমাজের উপযোগী করিয়াই বাহির করা হইল। অনাগত দিনের নাগরিক যাহারা

১. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাউয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২. গোলাম মোস্তফা ঃ মরুদুলাল গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আশা ভরসা সেই ছাত্র সমাজের মনে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের জীবনাদর্শ রেখাপাত করুক, তাঁর জীবন হইতে তাহারা আলো ও প্রেরণা লাভ করুক এবং সকলে সত্যাশ্রয়ী, উদার, নির্ভীক, চরিত্রবান ও কর্মবীর হইয়া উঠুক ইহাই লেখকের কামনা। হজরতের জীবনে যে সমস্ত আদর্শ বিশ্বজনীন হইয়া আছে জাতি–ধম–নির্বিশেষে যেখান হইতে সকলেই নৈতিক পাঠ গ্রহন করিতে পারে, 'মরু দুলালে' তাহারই প্রাচুর্য্য। এর আবেদন সকল হৃদয়কেই সমানভাবে স্পর্শ করিবে, এই ভরসা রাখি।"[১]

১. গোলাম মোস্তফা ঃ মরু দুলাল গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার কাব্য রচনায় ইসলামী ভাবধারা

গোলাম মোস্তফার স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। চলতি শতকের প্রথম দশকেই তাঁর রচিত কবিতা পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেন। তিনি মূলতঃকবি হিসেবেই পরিচিত। তার মানস চৈতন্য এবং সাহিত্যিক চিন্তা চেতনা প্রথম হতেই ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যবোধ এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আকাঙ্খা কেন্দ্রিক ছিল। এই ধারা তিনি আজীবন অনুসরণ করে গেছেন। গোলাম মোস্তফার অনেক কবিতায় বাস্তব সমাজ সচেতনতা এবং এক ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই কারণেই কবি সমালোচক আবদুল কাদির সেকালেই এক প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফাকে 'বস্তুতান্ত্রিক কবি' বলে অভিহিত করেন। [১]

গোলাম মোস্তফার আবিভার্বের সময়ে বিহারী লাল হতে আরম্ভ করে দেবেন সেন, অক্ষয় বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নতুন রচনা পদ্ধতির কাব্য ধারা দিয়ে বাঙালী হিন্দু পাঠক সমাজে ছন্দ, গান ও সুরের সুরধ্বনি বিস্তার করছিলেন। এই সব কাব্য ধারার সঙ্গে মুসলিম সমাজের কোন সংযোগ ছিল না। কবি গোলাম মোস্তফাই তখন প্রথম রবীন্দ্র লোক থেকে ভাষা, ছন্দ এবং ভাব আহরণ করে আপন মুসলিম সমাজকে অমৃত ভোগী করে তুলেছিলেন। [২]

স্কুলে পড়ার সময় ১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে গোলাম মোস্তফার রচিত প্রথম কবিতা 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' প্রকাশিত হয়। শিক্ষা জীবন শেষ করে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করার পর ১৯২৪ সনে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ "রক্ত রাগ"। কবির মোট সাতটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রক্তরাগ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ গুলো হল হাস্না হেনা (১৯২৭), খোশরোজ (১৯২৯), সাহারা (১৯৩৬), কাব্য কাহিনী (১৯৩৮), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৪৮) ও বনি আদম প্রথম খন্ড (১৯৫৮)। তাঁর একমাত্র কবিতা সংকলন বুলবুলিস্তান প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৭১ সালে কবি কাব্য গ্রন্থাবলী প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়।"[৩]

তাঁর কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত কবিতার প্রধান অবলম্বন ছিল

---

১. মোহম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, পৃ. ১৮

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল-মে-জুন'৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৪১

৩. নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৯৩ ইং, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম ও ইসলাম। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী ধারা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল মুসলমানকে তিনি একই জাতি হিসেবে মনে করতেন। সংকট মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা ইসলামী পুণর্জাগরণ কামনা করতেন।[১] যে সময় বাংলা সাহিত্যের আকাশে নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন কারো আবির্ভাব ঘটেনি। সেই কালে মুসলিম বাংলায় গোলাম মোস্তফাই একমাত্র কাব্য পথচারী যাঁর কবিতা স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা ক্লাসে পড়ত, বাইরে আবৃত্তি করত, মজলিশ মহফিলে সুর করে গাইত। বাংলার সেই হতাশাব্যঞ্জক মুসলিম সমাজের ভীরু জীবনে গোলাম মোস্তফার কবিতা ছিল ভ্রাম্যমান চারণের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের জাগরণী গান। তিনি তরুণদের অধীর আগ্রহ বুকে নিয়ে বড় হবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাদের সামনে জীবনের লক্ষ্যকে মহোন্নত করে, কণ্ঠে কুরআনের বাণীকে কবিতার ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে সুর ছন্দময় তর্জমা করেছেন।[২]

বিভিন্ন সময়ে পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত ২৯টি কবিতা নিয়ে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রক্ত রাগ"১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। রক্তরাগ কাব্য গ্রন্থটি উপহার পেয়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির জন্য নিম্নোক্ত আশীর্বাদের বাণী পাঠান–

"তব নব প্রভাতের 'রক্তরাগ' খানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।"[৩]

'রক্তরাগ'গ্রন্থ খানি সেই সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই গ্রন্থ খানি সম্পর্কে 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় লেখা হয়–"রক্তরাগ' তাঁহার কবি প্রতিভার পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পূর্ণভাবেই করিয়া দিবে।[৪]

এই কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'পরিচয়', ২৪ শে নভেম্বর ১৯১৬ সালের মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির মধ্যে কবির মানস জগত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কবিতাতে তিমির অন্ধকার ভেদ করে সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের পতাকাবাহী মুসলিম অগ্রযাত্রার পথ নির্দেশ করেছে। কবিতাটিতে আছে–"আবার যাদের মরুভূমি ছেয়ে ডাকিল প্রেমের বান,/বিশ্ব–প্রেমিক উদারপন্থী আমরা মুসলমান।/হৃদয় যাদের ঘিরিয়া রাখিল অজ্ঞানান্ধকারে,/স্বর্গ হইতে আলোক নামিয়া দেখিল বন্ধ দ্বার।/আবার যাহারা

১. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৩. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪. 'সাম্যবাদী'কার্তিক সংখ্যা–১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

আলোক নদীতে গাহন করিয়া সুখে/আলোক হস্তে ছুটিয়া চলিল বিশ্বের অভিমুখে।/আঁধার জগতে করিল যাহারা দিব্য আলোক দান/আলোকে রাজা বিশ্বে সে যে গো আমরা মুসলমান।[১]

এই কবিতায় কবির জাতীয়তাবোধ এবং মুসলিম সমাজ চেতনা ভাস্বর হয়ে উঠে।ইসলামের ঐতিহ্য বিশ্ব প্রেম তথা মানব প্রেম,উদারতা,সহনশীলতা এবং মানবিক আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব কথা প্রতিধ্বণিত হয়েছে কবিতাটিতে।[২] শেষের স্তবকটিতে তাই স্পষ্ট হয়েছে "জগতের মাঝে আমরা সবাই বিপুল একটি জাতি/লুকায়ে রয়েছে আমাদের মাঝে অসীম বীর্য–ভাতি/আমরা জগতে মরিবনা কভু,চিরকাল বেঁচে রবো।/যুগে যুগে লভি নূতন শক্তি বিশ্ববিজয়ী হবো।/এক তারে সবে বেঁধে দিব প্রাণ এক সুরে গাবে গান/মহামানবতা গড়িয়া তুলিব–আমরা মুসলমান।"[৩]

এর পরের কবিতা 'মরুর মহিমা' যেখানে আরবের মরুর জয়গান গাওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীকে এই মরু যে জ্ঞান ধারা দিয়েছে, মহানবীকে উপহার দিয়েছে, মিথ্যার পরিবর্তে সত্যের অম্লান শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছে এই কবিতায় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৪] কবি লেখেন–

"ঘন তম–সাবৃত চেতনা –বিবর্জিত
লাঞ্ছিত নিপীড়িত বিশ্ব,
তার মাঝে তুমি একা ফুটাইলে আলো-রেখা,
খুলে দিলে প্রভাতের দৃশ্য।
টুটে গেল তমোরাশি,ঘুচে গেল রাত্রি,
দলে দলে চলে শত আলোকের যাত্রী।"[৫]

কবি অন্যত্র লিখেছেন–

---

১. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, গোলাম মোস্তফাঃ কাব্য গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা'১৯৭১ ইং, পৃ–৫

২. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদক), ঐতিহ্য ,জুলাই–ডিসেম্বর'১৯৭১ (১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা) পৃ. ৫৪

৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬

৪. নিতাই দাস,প্রগুক্ত,পৃ. ৬৫

৫. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

"নহ নহ নহ তুমি বারিহীন মরুভূমি, —
অতি দীন, অতি হীন, তুচ্ছ,
মনে হয় তুমি কোন মায়াবীর মহামায়া, —
নহ তুমি মরু-ধূলিগুচ্ছ,
বিস্ময়–বিজড়িত তব সব কার্য
তব রূপ ঠিকরূপ করিবে কে ধার্য!
তব সম সারা ভূমি হতো যদি মরুভূমি,
ধরাধাম হতো তবে উচ্চ!"[১]

বইটির অপর কবিতা 'ঈদ উৎসব' সেখানেও তিনি ইসলামের সাম্য ও মহামিলনের বিজয় বারতা ঘোষণা করে লিখেছেন–

"আজিকে আমাদের জাতীয় মিলনের পূণ্য দিবসের প্রভাতে
কে গো ঐ দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া সবাকারে ফিরিয়াছে বিশ্বের সভাতে!
পুলকে সদা তার চরণ চঞ্চল
উড়িছে বায়ু-ভরে বসন-অঞ্চল,
সকল তনু তার শুভ্র–সুকুমার, স্নিগ্ধ স্বর্গের আভাতে।
কণ্ঠে মিলনের ধ্বণিছে প্রেম–বাণী, বক্ষে ভরা তার শান্তি,
চক্ষে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিভার বিশ্ব –বিমোহন কান্তি,
প্রীতি ও মিলনের মধুর দৃশ্যে
এসেছে নামিয়া সে নিখিল বিশ্বে,
দরশে সবাকার ঘুচেছে হাহাকার বিয়োগ–বেদনার শ্রান্তি।"[২]

গোলাম মোস্তফা এই কাব্য গ্রন্থের "মোস্তফা কামাল" কবিতায় তুর্কী বীর কামাল আতাতুর্ক এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন –

"তুমি বীর–তুমি যোগ্য পুত্র
ইসলাম জননীর। ---------
তুর্কী জাতির ধ্বংসের ভিতে
স্বাধীন মিশর! স্বাধীন মিশর!
ধন্য তোমার অযুতবীর,
রাখতে তোমার মহিমা–গরীমা অকাতরে যারা দিয়াছে শির,

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

নরনারী কতো হয়েছে নিধন,
দেশের লাগিয়া সঁপেছে জীবন,
এই যে মরণ নহে কো মরণ–জীবনেরি এযে লাল রুধির,
মরণের মাঝে জীবন নিহিত–বীর তারা–ইহা বুঝেছি থির।"[১]

এই কবিতায় মিশর বাসীর দেশপ্রেমের কথা বলতে গিয়ে কবির নিজের দেশপ্রেমও প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বে নবযুগ এসেছে,অত্যাচারীর আর কোন স্থান নেই,ভন্ডামীর দিন শেষ হয়ে গেছে,"বুঝি সবাই ন্যায়–অধিকার " কবির এসব কথার মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে নিজের দেশ সম্পর্কে এবার ব্যক্ত হয়েছে।[২] কবি এই কবিতায় এসব কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে –

"রবে না ধরায় অধীনে জীবন আত্ম–চেতনা–বিস্মৃতির
আপনার পানে দাঁড়াবে সবাই মুক্ত আকাশে তুলিয়া শির
স্বাধীন বাতাস–আকাশ–আলোক
অধিকার আছে মুক্তি –পুলকে,
কঠিন নিগড়ে কে চায় বাঁধিতে–কোন্ সে জালিম কোন্ কাফির?
স্থান নাই আর বিশ্বে এবার দস্যু –দানব–পিশাচীর।
নতুন রাজ্য গড়িলে চকিতে, —
এ–কি ভাঙ্গা গড়া দেখিতে দেখিতে!
কোন্ যাদুকর তুমি!" [৩]

মোস্তফা কামালের রক্তপান করতে যে পিশাচ সৈন্যরা এসেছিল,তাঁরা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বিশ্ব–পূজারীর স্বদেশ ও স্বজাতিকে বাঁচাবার জন্যে মৃত্যুপণ করে যুদ্ধ করেছেন–স্বজাতির মস্তকে তিনি যেন "খোদার হাতের কল্যাণ।" এই প্রশস্তির মধ্যে তুর্কী মুসলমানের প্রতি বাঙ্গালী কবির একটি আত্মীয়তাবোধ পরিস্ফুট হয়েছে। বিশ্বর মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই –এই চেতনাই কবিতাটিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে।[৪] এ ছাড়া বীর কেশরী মোস্তফা কামাল পাশার বিজয় উৎসব উপলক্ষে তিনি রচনা করেন 'বিজয় উল্লাস'। একই অনুপ্রেরণায় কবি রচনা করেন 'স্বাধীন -
মিশর' কবিতাটি। মিশরের স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন, তিনি

---

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২. শাহজাহান মুনির, বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ইং পৃ: ১৩০
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮
৪. শাহজাহান মুনির, বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত,পৃ:১৩০

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ১৯২২ সালে ব্রিটিশের নিকট হতে দেশের স্বাধীনতা সূর্য যাঁরা ছিনিয়ে আনে সেই মহান বীর মিশরবাসীর জয়গান করেছেন কবিতাটিতে।[১] তিনি লিখেছেন–'রক্তরাগ'কাব্য গ্রন্থের কবিতা গুলি ছন্দে যেমন অনন্য সাধারণ, তেমনি সুরের তারল্যে যে ব্যঞ্জনা এবং অনুপ্রয়াস লক্ষ্য যোগ্য তাও অসাধারণ। যেমন 'বন্দী'কবিতাটি –

"কারার মাঝে বন্দী নাহি, সে যে শুধুই গহন–মায়া ,
কারার মানুষ মানুষ নহে– সে যে তাহার শুধুই ছায়া!
আসল মানুষ বিরাজ করে দেশবাসীর হৃদয়–পুরে
সে যে আজি ছড়িয়ে আছে কাছে কাছে–দূরে দূরে!"[২]

গোলাম মোস্তফার দরদভরা সহমর্মী মনের পরিচয় পাওয়া যায় 'ব্যথিত বেদন'কবিতায়। তিনি লিখেছেন।–

"বুঝিয়াছো যদি ব্যথিতের ভাষা, কাঁদিয়াছে যদি প্রাণ,
আসিয়াছো যদি আঁখিজর ধারে দয়াময় রহমান!
ভৈরব রবে বিষাণ তোমার বাজিয়া উঠুক তবে,
অন্যায়-পাপ সব দূরে যাক্–ধ্বংস হউক সব।"[৩]

কবির প্রতিটি কবিতায়ই প্রার্থনার সুর পাওয়া যায়।

নিপীড়িত, বেদনাহত, লাঞ্ছিত পরাধীন ভারতে মুসলিম সমাজকে পথ দেখানোর জন্য এক মহানায়ক আবির্ভাবের কামনা করেছেন কবি 'হযরত মোহম্মদ'কবিতায়–

"ওগো বীর, জগতের আঁধারের ইন্দু,
আরবের নূর নবী, করুণার সিন্ধু!
কোথা তুমি? এসো পুনঃবিশ্ব –হিতার্থে,
বাজাইয়া দুন্দুভি, তরাইতে আর্তে।"[৪]

'রক্তরাগ'কাব্য গ্রন্থের'শিরচ্ছেদ'কবি রচিত একটি একাংক কাব্য নাটিকা।

---

১. শাহজাহান মুনির; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ.২১
৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

এটি চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে বিভক্ত। এর মূল বিষয় বস্তু ইসলামের ইতিহাসের একটি পরিচিত ঘটনা সম্বলিত। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছেন নির্ভীক ভাবে। আবু জহল কোরেশগণকে ডেকে বলল–

"এতকাল যে দেবতা ছিল প্রতিষ্ঠিত
কোরেশের ঘরে ঘরে, আশিস্ যাঁদের
শিরে ধরি ধন্য মোরা হইয়াছি সবে
তারা নাকি আজি সব অলীক-অসার—
প্রাণহীন, শক্তিহীন, মাটির পুতুল।
আর কিনা 'আল্লাহতায়ালা' উপাস্য সবার,
এই কথা মোহাম্মদ করিছে প্রচার।"[১]

এই প্রচারে আবূ জহল উৎক্ষিপ্ত। সে ঘোষণা করল, যে মোহাম্মদের শির এনে দিতে পারে তাকে পঞ্চ শত স্বর্ণমুদ্রা আর একশত উট উপহার দেয়া হবে। ঘোষণার সাথে সাথে ওমর এসে বললেন–

"প্রস্তুত এ দাস, প্রভো! দাও অনুমতি,
দুরাত্মার ছিন্ন শির আনিব নিশ্চয়।"[২]

ওমর তখন উলঙ্গ তরবারি হাতে মোহাম্মদের শিরচ্ছেদ করতে চলেছে। পথে নয়ীমের সাথে দেখা হলে সে জানালো তার ভগ্নি ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি সঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এবার ওমর ভগ্নি ফাতেমার গৃহের দিকে ছুটল। সে নির্মমভাবে তাদের প্রহার করতে লাগল; কিন্তু ফাতেমার কণ্ঠে অনর্গল ধ্বনিত হল পবিত্র কুরআনের মধুর বাণী।[৩] শেষ পর্যন্ত ওমর সেই বাণীতে মুগ্ধ হয়ে পাঠ করল–

"উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ ব্যতিত,
মোহাম্মদ নিশ্চয় বটে তাহারই প্রেরিত।"[৪]

ওমর রসূলকে হত্যা করতে আসছে এই সংবাদে নব্য মুসলিমগণ

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩. এ. জামান. যশোর গীতিকার ও নাট্যকার (প্রথম খন্ড), প্রকাশক–এ, বি, এ, আশরাফ উজ্জামান, লতিফ মঞ্জিল, নওয়া পাড়া রোড, ঘোপ, যশোর, ১৯৯৮ ইং পৃ. ১৭৭
৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী সবাইকে ওমরের সামনে যেতে নিষেধ করলেন এবং একাই তার সামনে যাবেন বলে ঘোষণা দিলেন। শেষ পর্যন্ত ওমর এসে নবীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লে নবী তাকে বুকে টেনে নিলেন।[১]

গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্যায়েই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন। তিনি হিন্দু –মুসলমানের পূর্ণ পরিচয় ও মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও আন্তরিকভাবে উচ্চারণ করেছেন।১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'আল এসলাম'পত্রিকায় প্রকাশিত কবি রচিত দীর্ঘ সংলাপ ধর্মী কবিতা 'হিন্দু–মুসলমান'–এ নরেনের জবানীতে রশিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

"---------হিন্দু মুসলমানে
যতোদিন না হইবে পূর্ণ পরিচয়,
ততোদিন প্রাণ থেকে মিলিবার আশা হবেনা সফল।
সঠিক স্বরূপ তত্ত্ব তব
তুলে ধরো আঁখি পটে দাও পরিচয়।"[২]

এখানে দুই সম্প্রদায়ের মিলন কথা বলতে গিয়ে দুইবন্ধু নরেন ও রশীদের আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠেছে। দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের মাধ্যমে 'ভারত–জননী'এর সেবা করার জন্য উভয়ে এই কবিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কবি লিখেছেন–

"এসো ভাই দাঁড়াইয়া মাতৃবক্ষে আজি
লই দীক্ষা, করিপণ–জীবন মরণে
এক হয়ে রবো মোরা,সমবেত ভাবে
সাধিব মায়ের কাজ;ভারত জননী
উভয়ের মুখপানে উঠিবে হাসিয়া;
ঘুচে যাবে দুঃখ-ক্লেশ ঘুচিবে বিরোধ,
ঘরে ঘরে কল্যাণের হবে অভ্যুদয়
ধন্য হবো মোরা সবে তৃপ্ত হবে প্রাণ
হেরিয়া যুগল–মূর্তি হিন্দু–মুসলমান।"[৩]

'কুড়ানো মানিক' মেয়ে কে অবলম্বন করে কবি পাঠকের মনে যে অপূর্ব ছবি

১. মজির উদ্দিন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পৃ. ৫২৫
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

এঁকেছেন তা কবির ভাষায় প্রকাশ পায়। কবি লিখেছেন –

"আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে,
হাসি–মাখা মুখ খানি চির–আদুরী,
ঝরে–পড়া স্বর্গের রূপ মাধুরী!"[১]

অন্যত্র কবি লিখেছেন –

"চলে গেলা পাশ দিয়া ক্ষিপ্র পদে –
বিজুলির ছোট রেখা নীল–নীরদে!
ছুঁয়ে দিনু কেশ –পাশ ভাল বাসিয়া
নেচে নেচে গেল সে যে মৃদু হাসিয়া!
শিহরিয়া উঠিলাম ঘন পুলকে,
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে।
ভ'রে গেল সারা প্রাণ একী হরষে।
এতখানি সম্পদ মৃদু পরশে!" [২]

কবি পাল্কী ওয়ালাদের নিয়ে রচিত হয়েছে 'উড়ে বেহারা'। নারীর সৌন্দর্য এবং স্বভাবের বর্ণনা করে রচনা করেন 'নারী' কবিতাটি। তিনি বাংলার রমণীর রূপের বর্ণনা করেছেন 'বঙ্গনারী' কবিতায়। এই কাব্য গ্রন্থের 'নিয়ন্ত্রিত কবিতাটি কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে। এই কবিতাটি 'বিদ্রোহী' কবিতার এই কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত অন্য কবিতাগুলো অবশ্য ভিন্ন ধর্মী। এসব কবিতাতে প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ এই বিষয়গুলোর উপস্থিতি রয়েছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে গমনরত মানুষের ব্যাথা–বেদনার কথা বর্ণিত হয়েছে 'পল্লী মা' কবিতায়। 'কিশোর' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কিশোর হৃদয়ে লুকায়িত আকাঙখার কথা। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি লিখেছেন–

---

২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন–নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি–পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো,
অরুণ–রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটবো গো!
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে
আকাশ পানে তুলবো মাথা, সকল বাঁধন টুটবো গো!"[১]

কবি রচিত 'কুড়ানো মানিক' কবিতাটি গীতি ধর্মী কবিতা। কবিতাটিতে তিনি অধিকাংশ লাইনের শেষে তিনটি অক্ষর বসিয়েছেন। এখানে চলে যাওয়া ছোট মেয়েটির চঞ্চল পদক্ষেপ যেন আমরা শুনতে পাই। ব্যঙ্গ করে তৎকালে যে সব কবিতা রচিত হয়েছিল তার থেকে স্বতন্ত্র। এখানে নজরুলের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব নেই;শুধু তাঁকে বিদ্রোহে বিবৃত করাই উদ্দেশ্য। সরল অর্থে স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই নজরুলের বক্তব্য বলে ভেবেছেন। তাই গোলাম মোস্তফা নজরুলের কবিতার মূল তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছেন।[২] এ ছাড়া তিনি রচনা করেছেন 'কবির আঁখি' 'ব্যথার গৌরব' কবিতা। 'রবীন্দ্র নাথ' নামক কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'মায়াবীর ছোট ছেলে' বলে জয়গান গেয়েছেন। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি' কবিতা রচনা করেন। রক্তরাগ গ্রন্থে প্রেম বিষয়ক কবিতা গুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে 'প্রথম চিঠি' 'আনন্দময়ী', 'ভূষণ' ও 'প্রেমের জয়' ইত্যাদি। এছাড়া প্রকৃতি নিয়ে রচিত কবিতা হচ্ছে 'সন্ধ্যারাণী', 'পরপারের কামনা'। 'সন্ধ্যারাণী কবিতায় কবি নিজেকে মনোরম ভাষা ভঙ্গীতে প্রকাশ করে লিখেছেন –

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

"সন্ধ্যা রাণী ! সন্ধ্যা রাণী !
এই যে মোদের গোপন মিলন কেউ জানে না
আমরা জানি।
পশ্চিমের ওই গগন কোণে
এলে তুমি সংগোপনে।
উড়িয়ে দিলে মৃদুল বায়ে রেশমী মেঘের আঁচল খানি।"[১]

বাংলা সাহিত্যে এ রূপ আবেগোচ্ছল গীতি কবিতা খুব অল্পই রচিত হয়েছে।[২] গোলাম মোস্তফা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে শোক গাঁথা রচনা করে ছন্দ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি' নামক কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান' সাহিত্য পত্রিকায় । তিনি লিখেছেন–

"আজ অজ্ঞাত এই সাগরেদ দেই অশ্রুর ফুলহার,
লও তুচ্ছ দান–বেদনার গান–বুল বুল বাংলার।"[৩]

গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'হাস্নাহেনা'প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। এতে প্রেম বিষয়ক ১৪টি কবিতা রয়েছে। এই কাব্য গ্রন্থের 'আনন্দময়ী','প্রথম চিঠির','ভূষন'– এই তিনটি কবিতা রক্তরাগ কাব্য গ্রন্থেও রয়েছে। কবির 'প্রিয়তমা'কবিতায় শিশু সূলভ সরলতা প্রকাশ পায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কবি অসাম্প্রদায়িক, দেশ –কাল–জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে কবির প্রেমিক হৃদয় ছুটে যায়। কবি লিখেছেন–

"কারা হিন্দু, কারা বৌদ্ধ, কারা জৈন, কারা মুসলামন
কারা যে ইহুদী আর কারা শুভ্র সাঁওতাল খৃষ্টান–
একথা পড়ে না মনে,
গোপনে গোপনে
হৃদয় ছুটিয়া যায়, এ উহারে করে কোলাকুলি,
বিধি নিষেধের বাণী মানে নাকো, সব যায় ভুলি।[৪]

কবির দেখা প্রিয়ার রূপ ফুটে উঠেছে'পাষাণী'কবিতায়। শরৎ প্রভাতে

---

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসাঃ কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃ. ২৬
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রগুক্ত, পৃ. ৫৮
৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

বনপথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয়ার রূপলাবণ্য কবি একদিন দেখেছিলেন। সেই মেয়েটি বিয়ের পর বধূ বেশে চলে গেল। কবি পথে পথে তার জন্য কেঁদে ফিরল না পাওয়া প্রেয়সীর বেদনায়।[১] এই কাব্য গ্রন্থের অপর একটি কবিতা হল 'শ্যালিকা'। কবিতাটির অধিকাংশ লাইনের শেষে তিন অক্ষরের শব্দ-যোজন করে লঘু পরিহাসটি কবি অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি লিখেছেন–

"সে যেন গো বিবাহের তাজা যৌতুক,
প্রণয়ের পাশে চির প্রেম–কৌতুক!
ফাগুনের বন–
মৃদু সমীরণ!
বিয়ে –ফুল মধুকরা যেন মউটুকু।"

কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তি হলো–

"মোটা পণ–লাল সার মন ভরো না,
শালী যেথা নেই সেথা বিয়ে করো না!"[২]

এছাড়া 'হাস্নাহেনা'কাব্য গ্রন্থের অপর কবিতা গুলো হল 'কবির বিজ্ঞাপন', 'নিরাশায়', 'ভোরের বায়', 'বউ কথা কও', 'নিশীথ রাতের মুসাফির' ইত্যাদি। 'হাস্নাহেনা'কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশের পর 'সওগাত পত্রিকায় এই সর্ম্পকে মন্তব্য করা হয়–

"ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক। 'রক্তরাগে'তাঁহার যে শক্তি'ফুটে ও ফুটে না'অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, 'হাস্নাহেনা' তা অনেকটা ফুটিয়েছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। প্রার্থনা করি কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্ধিত হউক এবং তাহাতে দরিদ্র মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।"[৩]

গোলাম মোস্তফার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খোশরোজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। এই কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'নূতন যুগ'। কবিতাটিতে কবি নূতনের জয়গান গেয়েছেন। 'মুসলিম'কবিতাটিতে মুসলিম জাতিকে কবি নির্ভীক চিত্তে জেগে উঠার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি এই কবিতা ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন বীর গাঁথার বর্ণনা দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন বীর গাঁথার

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
৩. 'সওগাত' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা দিয়েছেন ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর কৃপায় কিভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। কবির ভাষায় –

"তারপর এলো আরব–মরুতে খোদার রসূল–নূরুন্নবী,
কোরেশ আসিল কতল করিতে বিশ্বের সেই আলোক–রবি!
বলো কে মরিল? মোহাম্মদ ? না আততায়ী সেই কোরেশ জাতি?
ঘাতক শেষে যে রক্ষক হয়ে ধরায় রাখিল অতুল খ্যাতি!
'আবু লাহাবের' হাত কাটা গেল, হালাক হইল 'হালাকু' পরে,
সেলজুক আজি শত্রু নহেকো – মুসলিম তারে সালাম করে!"[১]

'ফাতেহা–ই–দো আজদহম' কবিতায় কবি মহানবীর স্মৃতি চারণের মধ্যে মানব জীবনের শক্তি সাহসের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। রসূলের আদর্শকে তিনি স্মরণ করেছেন এভাবে –

"হে রসূল ! আজি তব শুভ জন্ম উৎসবের দিনে,
যে সুর উঠিল বাজি অনাহত মোর মনোবীণে,
তাহারে ধরিয়া লব জানি নাকো কোন্ বাণী দিয়া,
সারা চিত্ত ছন্দে–গানে উঠিয়াছে ব্যাকুল হইয়া।

– –

হে রসূল! আজিকার এই পূণ্য প্রভাত-আলোকে,
তোমারে সালাম করি দূর হতে পরম পুলকে!
উৎসবের মাঝে আজি এই কথা যেন নাহি ভুলি–
তুমি শুধু কারো নাই ধন্য এই ধরণীর ধূলি,
পূণ্য-প্রেম, শান্তি –প্রীতি–ইহারা ও তব সাথে সাথে
জনম লভেছে আজ এই পূণ্য আলোক–প্রভাতে!
জাগিয়া উঠুক আজি এই দিনে আমাদের মনে
কি অসীম শক্তি আছে লুকাইয়া মানব জীবনে! "[২]

'শবে বরাত' কবিতায় কবি মুসলমানগণকে ইবাদত করতে আহবান জানিয়েছেন এবং বিশ্ব বিধাতার কাছে জাতির মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন–

"শবে বরাতের রাত্রিতে আজি চাহিনাকো শুধু ধন ও মান,

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫–৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশি–জাতিরে দিও গো মুক্তি–দান!
জাগরণ লিখো নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,
নব গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান!"

'কোরবাণী' কবিতায় কবি মুসলিমগণের পবিত্র ঈদ–উল –আযহার তাৎপর্য তুলে ধরে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। 'আল–হেলাল' কবিতায় কবি ঐতিহ্য এবং কাব্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন এই ভাবে–

"চমকে উঠে দেখুন চেয়ে নীল গগণের আঙ্গিনাতে,
আলোর দূতি!দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধ মধুর ভঙ্গিমাতে!
নীল দরিয়ার ওপার হতে রত্ন–মানিক বোঝাই করি
সাঁঝের আলোয় আজ কি ঘাটে ভিড়লো––
আমার সোনার তরী?"[১]

দিল্লী, আগ্রা, আফ্রিকা, পারস্য, আন্দালুশিয়া–সর্বত্র ইসলাম যেভাবে বন্ধ্যাত্ব দূর করেছে বাংলায়ও ইসলামী জাগরণ তেমনি ভূমিকা পালন করবে বলে কবি আশাবাদী। কবি রচিত 'রীফ-শরীফ' কবিতায় তাই তিনি লিখেছেন –

"দীর্ঘ সুপ্তি অবসাদ পরে
এসেছে সুদিন ইসলামের,
'আবু ওবায়দা' 'মুসা'ও 'খালেদ'এলো কি ফের?
সংখ্যার যতো শঙ্কা আজিকে হয়েছে দূর,
জ্বলছে আবার সত্যের শিখা –'দ্বীনের নূর'!
সীমা নাহী এ আনন্দের!
আশার রাগিনী বেজেছে আবার
জীবন কুঞ্জে মুসলিমের!" [২]

বিশ্ব নবীর জীবনাদর্শই ছিল কবির রাষ্ট্র জ্ঞানের মূলমন্ত্র। 'খোশরোজ' কাব্য গ্রন্থের 'খেয়াল' কবিতার প্রথম তিনটি স্তবকে চমৎকার ভাবে তিনি একটি পরিবর্তিত জীবনের আকাঙ্খা করেছেন। কবির ভাষায়–

"আমায় তুমি ভেঙ্গে আবার গড়ো জীবন স্বামি !

---

১. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

একলা শুধু আমার মাঝে রইবো না আর আমি!
হাজারভাবে হাজার কাজে
ছড়িয়ে যাবো জগৎ মাঝে
হাজার রূপে আমায় আমি দেখবো দিবসযামী!
পূর্ণ আমায় খন্ড করে করবো শতেকখান,
দিকে দিকে বিভাগ করে ছড়িয়ে দেবো প্রাণ!
আছে যেথায় যত অভাব।
সবার ডাকেই দেবো জবাব,
ঘুচাবো এই সুস্থ জাতির দৈন্য –অপমান।
সবার আগে হবো আমি খাঁটি স্বদেশ নেতা,
'চালক' হয়ে চলবো নাকো স্বার্থ চালায় যেথা।
নেতা– সে তো দেশের সেবক
জাত পুকুরের নয়কো সেবক!
স্বার্থ নহে– দেশেই যে তার প্রভূ এবং ক্রেতা"[১]

তিনি প্রতিভার মূল্যায়ন করতে জাতিভেদ মানতেন না। বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। মুসলিম জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মৃত্যুতে গোলাম মোস্তফা শোক–গাঁথা রচনা করেছেন, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। অনুরূপ ভাবে হিন্দু মনীষী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মৃত্যুতেও তিনি কবিতার অর্ঘ্য দান করেন।[২] 'বঙ্গবীর আশুতোষ' কবিতায় কবি শোকাহত হৃদয়ে বলেছেন–

"হে বঙ্গের আশুতোষ! বাঙালীর জাতীয় গৌরব!
গগণে পবনে তুমি রেখে গেছো যে সুধা সৌরভ,
আজো তাহা পুলকিত করিতেছে সবার অন্তরে –
সে সৌরভ জেগে রবে হিয়াতলে নিত্য-নিরন্তর।"[৩]

এই কবিতাটি বাদে 'হাস্নাহেনা' কাব্য গ্রন্থের সবগুলো কবিতাই মুসলমান

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
২. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে লেখা। প্রথম জীবনের ভাসা ভাসা ইসলামী আদর্শ এখানে কবি কিছুটা পরিপক্কভাবে উপস্থাপনা করেছেন। মুসলিম সম্প্রদায় মধ্যযুগে যেমন শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল তার জন্য চোখের পানি ফেলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুণরায় নব উদ্যমে উন্নত শিরে অগ্রসর হতে আহবান জানিয়েছেন মুসলিম জাতিকে[১]। 'মুসলিম' কবিতায় কবি লিখেছেন–

"দৃপ্ত গর্বে জেগে ওঠ্ তবে বাধা বন্ধন দু'পায়ে দলি
আঘাত সহিয়া বাঁধন কাটিয়াত চলারেই মোরা জীবন বলি।
নস্ নস্ তুই ছোট ন'স্ –তুই হীন ন'স তোর বিরাট খ্যাতি,
মুসলিম তুই–বিশ্বাস কর –জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ–জাতি।"[২]

'বেদুইন' কবিতায় মরুভূমির তপ্ত ধূলিকণা বাংলার মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে বাংলার 'চির–শ্যামলতা;চিরসমতা'এর মতো 'অভিশাপ'দুর করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন। দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন, হাকিম আজমল খাঁ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ আমির আলী স্মরণে লেখা চারটি কবিতায় কবি সকলকে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। 'ভবিষ্যতের স্বপ্ন' কবিতায় কবি তাঁর কাঙ্খিত স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়ে সারা বিশ্বে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন এই কবিতায় কবি দেখতে প্রয়াসী হয়েছেন[৩]। তাঁর এই স্বপ্নের কথা কবি ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে–

"পূর্ব–পশ্চিম মিলিল আজ,
মহা–মানবের মিলন তীর্থ
বসিল বিশ্ব জগৎ–মাঝ!
ধলা–কালা–পীত সকলি শিষ্য,
মধুর এ নব মিলন দৃশ্য!
ইসলামী শাহী পতাকার তলে
প্রজা হলো আজি সকল রাজ!
চরণে বিনত বিদ্রোহী যতো,–
শান্তি–রাজ্য করে বিরাজ!"[৪]

কবি মুসলিম তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান

১. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
২. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৩. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৪. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

'তরুণের অভিযান'নামক কবিতায়–

"মুক্ত–নিবিড় নীল–পথে আজ ডাক এসেছে মোদের নামে
ইসলামের এই তরুণ দলই জাগবে ফের দ্বীন্–ইসলামে
অসীমের ওই নিমন্ত্রণে
যোগ দেবো আজ সবার সনে
মুক্ত হবো–স্বাধীন হবো–মুক্তি–বাণী বিশ্বে কবো।"[১]

'তরুনের গান'কবিতায় কবি লিখেছেন–

"তরুণ দলের যাত্রা আজ,আজ আমাদের খোশ এ দিন।
খোশরোজের এই উৎসবে আয়রে তরুণ মুসলেমিন ॥" [২]

কবি ইসলামী জেহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানান'নও জামানার গান'কবিতায় –

"তোরা শুনতে কি পাস্ দুর পথে ওই নওজামানার গান?
কারা আসছে দেখ ওই বাজিয়ে ভেরী দুন্দুভি–বিষাণ ॥
তাদের হস্তে নূরের ঢাল–তলোয়ার,শীর্ষে উজ্জ্বল তাজ।
তারা উড়িয়ে দেছে আসমানে লাল আল্–হেলাল্–নিশান॥"[৩]

কবির'সাহারা কাব্য'গ্রন্থটি ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য গ্রন্থে তাঁর ১১ টি কবিতা স্থান পায়। এই কাব্য গ্রন্থের কবিতা গুলো মূলত প্রেম বিষয়ক। কাব্য গ্রন্থটির শুরুতে কবি চিত্র–শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের উদ্দেশ্যে লিখিত সমিল বাক্যাবলীতে এই কাব্য গ্রন্থ রচনার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। কবি লিখেছেন–

"কাসেম—
গোপন ব্যথা ঘুমিয়ে ছিল আমার মনের কোণে,
জানতে না কেউ, সে ছিল নিশ্চুপ,
তুমি তোমার সোনার তুলির স্নিগ্ধ পরশনে,
জাগিয়ে তারে দিল নতুন রূপ!
আমি ছিলাম অনেক দূরে —বিজন সাহারাতে,

১. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৪
২. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৪
৩. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

জীবন আমার কাটতো সেথায় একা,
আপনি তুমি ভাল বেসে তিমির–গহন রাতে
হঠাৎ সে দিন দিলে এসে দেখা।
আমার হিয়ার পাত্র হতে নিলে কাজল–কালি,
ফুটিয়ে দিলে মোর বেদনার ছবি,
তোমার রঙে রঙিন হলো আমার ফুলের ডালি,
প্রীতি জানায় তাই তোমারে কবি।''[১]

সাহারা কাব্য গ্রন্থটি সুর–শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহম্মদকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন–

''আব্বাস––
তোমার সুরের সাথে আছে আমার সুরের মিল,
তুমি জানো, কোন বেদনায় কাঁদে আমার দিল!
আমার ব্যাথা দরদ দিয়ে বুঝবে তুমি,ভাই,
এই'সাহারা' তোমার হাতে দিলাম আজি তাই।''[২]

এই কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলো কবির হাহাকারে ভরা হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত কবির প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে যে একাকীত্ব অনুভব করেছিলেন তারই ফলে এই কবিতাগুলো রচিত হয়েছিল। এই কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল' এর শুরুতেই দেখা যায় কবির গভীর আঁখি জলের মধ্যে হঠাৎ প্রিয়ার আগমন ঘটে এবং তার ফলে কবি সব দুঃখ ভুলতে সক্ষম হয়। এই স্বপ্ন দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। কারণ অচিরেই কবিকে স্বপ্ন বিহার ছেড়ে নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। অবশেষে তিনি এই ভেবে স্বস্তিলাভ করলেন যে,জীবিতাবস্থায় না হোক, মৃত্যুর পর প্রিয়ার সাথে মিলিত হবেন।[৩] সাহারা কাব্য গ্রন্থের অন্যান্য কবিতা গুলো যেমন–'প্রেমের অভিশাপ' 'ফেরদৌসির স্বপ্ন; 'পরাণ কাঁদে সেই নিরাশার গভীর বেদনায়;'তোমারে যে আমি করেছি রূপসী কবির দৃষ্টি দিয়া; 'কবির প্রেম;

'অশ্রুলিপি;'রহস্যময়ী;'একখানি বেদনার মালা;'শেষক্রন্দন'প্রতিটি

১. গোলাম মোস্তফা লিখিত 'সাহারা'কাব্য গ্রন্থের পত্রটি দ্রষ্টব্য।
২. গোলাম মোস্তফার 'সাহারা'কাব গ্রন্থের উৎসর্গ–পত্রটি দ্রষ্টব্য।
৩. নিতাই দাস,প্রাগুক্ত,পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় নিঃসঙ্গ প্রেমিক হৃদয়ের বিরহকাতর ছবি ভেসে উঠে। তিনি স্বপ্নে–জাগরণে প্রিয়তমার রূপ দেখেন। 'শেষ ক্রন্দন'কবিতায় কবি বিরহের জন্য নিজেকেই দায়ী করেছেন এবং সেই সঙ্গে অভিমান ভরা কণ্ঠে খোদাকেও দায়ী করেছেন। যেমন–

"এমনি করেই ফাঁকি দিয়ে মন ভুলিয়ে সব লোকে,
হাসিল করে নিচ্ছে খোদা সব কাজই তার দুই লোকে,
ইহকালে নারী এবং পরকালে হুরীর লোভ
স্বপ্ন সম রেখেছে সে জাগিয়ে মোদের দুই চোখে।"[১]

এই কবিতায় কবি মনে করেন বিধাতার বিশাল কর্মক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা আর কতটুকু?এই প্রশ্নও কবির মনে জেগেছে। মানুষের জীবন দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে–মানুষ দুঃখের মধ্যে ও সুখের স্বপ্ন দেখে। জীবনে ইপ্সিত প্রিয়ার দেখা না পেলেও মরণের পর প্রিয়ার সাথে মিলিত হতে পারবে এই ছবিও বিরহী হৃদয়ে জেগে উঠে। কিন্তু বিরহী হৃদয় খোদাতা'লার এই বিধান মান্নাতে গিয়ে অনেক সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাই সে মাঝে মাঝে বিধাতাকে প্রশ্ন করেছে। আর এভাবেই কবি তাঁর কাব্য গ্রন্থটি শেষ করেছেন।

গোলাম মোস্তফা রচিত'কাব্য–কাহিনী'কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়১৯৩২ সালে। এই কাব্য গ্রন্থে ১৭টি কাহিনীর কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে। এই কাব্য গুলোর অধিকাংশই মুসলিম বীরগণের শৌর্যবীর্য,মহত্ব ও ত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'এর অনুসরণে কাহিনীগুলোর কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে। কাহিনীগুলোকে কবিতার ছাঁচে ঢেলে জীবন্ত করে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে।[২] তাঁর 'কাব্য–কাহিনী'গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাস এবং কুরআন–হাদীস থেকে তথ্য–উপাত্ত নিয়ে বিবিধ এবং কুরআন–হাদীস থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে ইতিহাস এবং কুরআন–হাদীস থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে বিবিধ কাহিনী রূপে তা প্রকাশ করেছেন।[৩] এই গ্রন্থের কবিতার নাম 'মানুষ'–এর উপাখ্যান অংশটি পবিত্র কুরআন শরীফ হতে নেয়া হয়েছে। মানুষের সংগ্রামের তাৎপর্য যে স্বয়ং আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন দুনিয়াতে পাঠাবার সময়। তা কবি 'মানুষ' কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে তুলে ধরেছেন। কবিতাটির মূলভাব নেয়া হয়েছে সূরা আল

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৭
২. নিতাই দাস,প্রাগুক্ত,পৃ. ৭১
৩. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক),প্রাগুক্ত,পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

বাকারা হতে। কবির ভাষায়–

"ডাকি সবে ফের
কহিলেন খোদাতালা –"এই যে আদম
নিখিলের সার সৃষ্টি –শ্রেষ্ঠ অনুপম
ইহায়ে সালাম করো।
শুনি সে আদেশ
তামাম ফেরেস্তা-জীন ধরি ফুল্লবেশ
প্রণতি করিয়া ধীরে আদমের পায়
শ্রদ্ধাঞ্জলী করিল প্রদান।
শুধু হায় !
অভিমানী 'আজাজিল'-ফেরেশতার নেতা
নোয়াল না শির তার। দাঁড়াইয়া সেথা
কহিল সে –" আমি কেন করিব সালাম
আদমেরে ? কে শুনেছে কবে তার নাম?
আজাজিলের এই অহংকার ভরা বাণী শুনে
আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দেন।"[১]

কবির ভাষায়-

"কহিলেন খোদাতালা –'হায় মূঢ় প্রাণী!
এত বড় স্পর্ধা তব ? এত অহংকার ?
লও তবে বিদ্রোহের যোগ্য পুরস্কার –
আজি হতে নাম তব হলো 'শয়তান'
তোমার অন্তর ভরা দম্ভ – অভিমান
কলঙ্কের মালা হয়ে কণ্ঠদেশ তব
আঁকড়ি রহিবে সদা ! এই অভিনব
শাস্তি আমি দিনু তোমা।" [২]

এরপর হতে শয়তান মানুষের বিরুদ্ধে নানা ছলে কৌশলে অমঙ্গল কামনা করে। ছদ্মবেশে মানুষের সকল প্রকার ক্ষতি সাধনের দৃঢ় সংকল্প সে গ্রহণ করে। সেই থেকে সংগ্রাম শুরু হয় মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে। কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি মানুষের প্রতি আল্লাহ্র হুঁশিয়ার বাণীর বর্ণনা দিয়েছেন এই

১. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২০৮
২. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে –

"আদমের পানে চাহি কহিলেন খোদা –
" যাও তবে, হুশিয়ার হ'য়ে থেকো সদা।
আজি হ'তে শুরু হ'ল অভিযান তব
গ্রহে গ্রহে লোকে লোকে নিত্য নব নব।
তুমি যে সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ গরীয়ান
এ সত্যের যেন নাহি কর অপমান।"[১]

' মক্কা বিজয়' কবিতাটিতে কবি ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর মক্কা বিজয়ের ইতিহাস সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মক্কা বিজিত হবার পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) বন্দীদের মুক্তিদানের বিষয়টি কবি তুলে ধরেছেন এইভাবে –

" কহিলেন নবী হাসি তখন–
ভেবেছো ঠিকই বন্ধুগণ!
কঠোর দন্ড হবে বিধান !
ধরো সে দন্ড – কহিনু সাফ্ –
সব অপরাধ আজিকে মাফ্
যাও সবে দিনু মুক্তি দান।"[২]

সেই সময় কোরেশগণের যে অভিব্যক্তি তা কবি তুলে ধরেছেন এইভাবে –

"এত বড় ক্ষমা ? অসম্ভব !
দুনিয়ার কোন্ মহানুভব
করেছে কোথায় ? কবে কখন্ ?
যাঁর প্রতি এত করুণা তাঁর ?
স্তম্ভিত হলো কোরেশগণ।"[৩]

কবিতাটির শেষ কয়েকটি পংক্তি হলো –

"পূর্ণপ্রেমের পরশ-ঘায়
লুটালো সবাই নবীর পায়
নিল মুখে তারা খোদার নাম,

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
২. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২১৫
৩. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

মনের কালিমা হইল দূর আলোকিত হলো হৃদয়পুর–
কবুল করিল দীন্ ইসলাম।
কহিলেন নবী হাসি মুখে
এ নহে আমার মক্কা –জয়
মিথ্যা আঁধার করিয়া দূর
জয়ী হলো আজি সত্য নূর.–
ধন্য খোদা– সে মহিম ময়।"[১]

কবির 'কোরবাণী' কবিতায় হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে খোদার আদেশে কোরবাণী দেয়ার যে কাহিনী তা বর্ণনা করেছেন। সিরিয়া বিজেতা সেনাপতি খালিদের সেনাপতির পদ বাতিলের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছেন "অগ্নি –পরীক্ষা" নামক কবিতাটি। দুই কৃষক ভ্রাতার পরস্পরকে শস্য/ ফসল দান করার বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে ' দান' কবিতাটি। সিন্ধু বিজয়ী বীর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন্ কাসিম এর মৃত্যুর কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন 'মরণ-বরণ'কবিতাটি।[২] বাগদাদের এক ঠগ নাপিত আলি শাকিলের ধুর্ততার কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'প্রতিফল' কবিতাটি। কেরমান্‌বাসী শাহ্‌সুজা অতি সংযমী দরবেশ ছিলেন। তাঁর এক কুমারী কন্যা ছিল। একদিন এক সুলতান দরবেশের নিকট আসে এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু দরবেশ তা প্রত্যাখ্যান করে একদিন সকাল বেলা মসজিদে এক তরুণ তাপসের সাথে শাহ্‌সুজার পরিচয় ঘটে। শাহ্‌সুজা তরুণকে তাঁর কন্যাকে বিবাহ্ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু যুবক বলিত তাঁর তিনটি পয়সা মাত্র সম্বল আছে। শুনে শাহ্‌সুজা তার কাছেই কন্যার বিবাহ দিলেন। শাহ্ সুজার কন্যা স্বামী গৃহে যাবার পর দেখল তার স্বামী আগামীকালের জন্য একটি রুটি কিনে রেখেছে। শাহ্‌সুজার কন্যা তখন আল্লাহ্‌র করুণার প্রতি নির্ভর করার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন এবং স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পারে। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গোলাম মোস্তফা রচনা করেন "তাপস-কুমারী" নামক কবিতাটি।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী'র বাংলা বিজয় নিয়ে কবি

১. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২১৬
২. নিতাই দাস,প্রাগুক্ত,পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন 'বঙ্গ বিজয়' কবিতাটি। 'বঙ্গ বিজয়' কবিতায় কবি জাতীয় ঐতিহ্যে বলীয়ান হয়ে মুসলিমগণকে এগিয়ে যাবার জন্য বলেছেন–

" সম্মুখভাগে চলে বীর দল মিলিত কণ্ঠে গাহিয়া গান,
মুসলিম মোরা নির্ভীক চির উন্নত শির মুক্ত প্রাণ।"[১]

ইসলামের সাম্য ভ্রাতৃত্বের কথা তুলে ধরে কবি খলিফা ওমরের কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'রাখাল খলিফা' কবিতাটি। হযরত ওমর জেরুজালেম গমনের সময় উটের পিঠে বসা ছিলেন এবং ভৃত্য উটের রশি হাতে হেঁটে চলছিল। এই দৃশ্য হযরত ওমরকে ব্যথিত করে। তিনি ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়তে বললেন। কবি এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি লিখেছেন –

" না ছোড় খলিফা, কোন কথা তিনি তুললেন না তাঁর কানে
রাজী হল তাই অগত্যা নওকর।
রাখাল চলিছে উটের পিঠে – খলিফা লাগাম টানে।
এ মহা দৃশ্য অপূর্ব –সুন্দর। "[২]

'রাখী ভাই', 'মোগল প্রহরী', 'প্রতিশোধ' ইত্যাদি কবিতায় তিনি হিন্দু–মুসলমানের মৈত্রী বন্ধনের চিত্র এঁকেছেন। 'সিরাজী ও আফজাল খাঁ এবং 'শ্রী হিন্দুগড়' কবিতায় মুসলমানগণের প্রতি মারাঠা ও শিখদের বিশ্বাস ঘাতকতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'জীবন বিনিময়' কবিতায় বাবরের পুত্র হুমায়ুনের রোগ মুক্তির জন্য বাদশাহ বাবরের ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। চিতোরের রাণীকে রক্ষা করার জন্য বাদশাহ হুমায়ুনের আত্মঘাতী চিত্রের সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে 'রাখি ভাই' কবিতায়। কেদার রায়ের বোনকে ঈসা খাঁ'র হরণ করে নেয়ার পর তাঁর পুত্রের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ দেন। এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে গোলাম মোস্তফা রচনা করেন 'প্রতিশোধ' কবিতা।[৩]

'কাব্য কাহিনী' গ্রন্থে গোলাম মোস্তফা রচিত 'প্রশ্নের উত্তর' নামক কবিতাটি একটি একাঙ্কিকা নাটক। দু'টি দৃশ্যের মাধ্যমে নাস্তিক, দরবেশ এবং তাদের বিচারক 'কাজী' চরিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কবিতাটির কাহিনী ছিল এরূপ– এক নাস্তিক দরবেশকে ৩টি প্রশ্ন করে– প্রশ্ন তিনটি ছিল–

১. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩৪
২. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২২২
৩. নিতাই দাস,প্রাগুক্ত,পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

(১) আল্লাহ্‌কে না দেখে কিভাবে বিশ্বাস করব ? (২) শয়তান আগুনের তৈরী হলে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁকে আবার আগুনে পোড়াবে? (৩) মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, সবই আল্লাহ্ করান মানুষকে দিয়ে, তবে কেন তার শাস্তি আমরা পাব ? উত্তরে দরবেশ নাস্তিকের মাথায় ঢিল ছুঁড়ে তার প্রশ্নের উত্তর দেন। নাস্তিক কাজীর কাছে বিচার দিলে কাজী দরবেশকে ধরে আনার জন্য কতোয়াল পাঠালেন। এরপর কাজীর নিকট একে একে নাস্তিকের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেন। উত্তর শুনে নাস্তিক দরবেশের উদ্দেশ্যে ক্ষমা চায়। কবির ভাষায় –

"নাস্তিক ! ক্ষমা করো অপরাধ মোর,
পেয়েছি উত্তর আমি।
নাহি আর মোর কোন অভিযোগ।
(দরবেশের প্রতি)
হে দরবেশ !
করজোড়ে ভিক্ষা চাহি আজ –
ক্ষমা মোর প্রগল্‌ভতা!
কাটিয়া গিয়াছে মোর মোহ অন্ধকার,
দিব্যি দৃষ্টি ফুটিয়াছে নয়নে আমার;
নহি আমি ভ্রান্ত আর।
আল্লাহ আর রসুলের পরে
আজি হতে আনিনু ঈমান –
আজি হতে হইলাম আমি সাচ্চা মুসলমান।"[১]

এছাড়া গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে সকল কবিতা লিখেছেন, তা 'বুলবুলিস্তান' নামক কাব্য গ্রন্থের শেষে দেয়া আছে। কবিতাগুলো হল –'লীগ বিজয়','আমানুল্লাহ্','বাচ্চা সাক্কা','নাদির খান','বিশ্ব সুন্দরী',. 'কবি','মানসী','মৃত্যু–উৎসব', 'দুঃসাহসিকা,' 'ক্রন্দসী','সন্ধানী', 'শিক্ষক', 'মোহসীন স্মরণে', 'বিশ্বনবী', 'দার্জ্জিলিং–এর স্বপ্ন,', 'জিন্নাহ্ জিন্দাবাদ','মণিমালার বিয়ে', 'গর্ভবতী,' পল্লী বালিকার কলিকাতা বিরাগ', 'গান্ধী শোকে', 'কায়দে আজম জিন্দাবাদ','কবিতাগুলো।

গোলাম মোস্তফার 'কাব্য–সংকলন'গ্রন্থটিতে সৈয়দ আলী আশরাফের

১. গোলাম মোস্তফা,প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনায় ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি কবির বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থ হতে নেয়া কবিতার সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ২২শে নভেম্বর ১৯৩১ সালে কলিকাতা টাউন হলে রবীনন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে কবি কর্তৃক পঠিত স্বরচিত কবিতা –

"রবীন্দ্র জয়ন্তী"

--গোলাম মোস্তফা

"সালাম, সালাম, তোমায় আজি, হে কবি সম্রাট,
মুকুট–বিহীন বাদশা মোদের অক্ষয় রাজপাট!
বখত্ মোদের নেক্---
তোমার অভিষেক
সভায় আজি করছি তোমার নামী গাঁথা পাঠ।
নামটি তোমার 'রবি'--তুমি রবির মতই ঠিক,
তোমার আলোয় উঠল হেসে ধরার চতুর্দিক।
পূর্ব ও পশ্চিম
নির্বাক নিঃসীম,
চেয়ে আছে তোমার পানে নয়ন অনিমিখ্।"[১]

বেগম রোকেয়া'র মৃত্যু সংবাদে তিনি দুঃসাহসিকা কবিতা রচনা করেন–

" দুঃসাহসিকা"

(মিসেস আর, এস, হোসেনের এন্তেকালে)

"আঁধার রজনী নিদ্রিত পুরী নাহি জন কোলাহল;
মরণ–তন্দ্রা বিছায়েছে তার শিথিল নীলাঞ্চল।
দুর্যোগ–রাতি, নিভিয়া গিয়াছে শিয়রের দীপ–শিখা,
ঘরে ঘরে আজ জাগিতেছে শুধ্ মৃত্যুর বিভীষিকা।
এ–গভীর রাতে কে তুমি জননী, কল্যাণ–দীপ জ্বেলে
এই বাংলার নিদ–মহলার তিমির দুয়ারে এলে?
মৃত্যু–মলিন আধাঁর কক্ষে করিলে আলোক পাত,
অভয়–মন্ত্র ফুকারি কণ্ঠে দ্বারে দিলে করাঘাত?"[২]

[দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ]

গোলাম মোস্তফা রচিত ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত 'বনি আদম' কাব্যের প্রথম

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন(সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

২. গোলাম মোস্তফা, বুলবুলিস্তান, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী ৪৫ মীর্জা পুর স্ট্রীট, কলিকাতা ও ৯৫, ইসলাম পুর, ঢাকা– পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

খন্ডে আদম–হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই কাহিনী নিয়েই 'কাব্য কাহিনী' কাব্য গ্রন্থের 'মানুষ' কবিতাটি রচনা করেছিলেন যা পূর্বে বলা হয়েছে। 'বনি আদম'–এর প্রথম খন্ড সেই কবিতারই সম্প্রসারিত রূপ।[১] কাব্যের পূর্বে লেখনের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শক্তি প্রার্থনা করে কবি বলেন–

"হোমার, ভার্জিল, রুমী, দান্তে, মিলটন
বাল্মিকী, মাইকেল, রবি আর ইকবাল–
সবারি অন্তরে দেছো আলোর পরশ
সেই মতো আমারেও করো কৃপা দান।"[২]

মহাকাব্যিক ঘটনা, পরিকল্পণা ও বিস্তৃতি নিয়ে তিন খন্ডে 'বনি আদম' রচনা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে ও গোলাম মোস্তফা 'বনি আদম'–এর প্রথম খন্ডই লিখতে সক্ষম হন। এই কাব্যেই আল্লাহ ও শয়তানের সম্পর্ককে তিনি আশেক মাশুকের সম্পর্ক বলে কল্পনা করেছেন। এখানে তিনি সূফীতত্ত্ব ও বৈষ্ণবদের প্রেমতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৩] এখানে তিনি কুরআন শরীফ ও হাদীস অনুসরণে হযরত আদম ও তাঁর সঙ্গিনী বিবি হাওয়ার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। মূলত এই রচনাতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ এবং শয়তানের চিরন্তণ কাহিনী বর্ণনা করা।[৪] তিনি 'বনি আদম'–এর মাধ্যমে শয়তানের সকল মতলব ফাঁস করে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে যে সব অনর্থ ঘটেছে এইসবের পেছনে যে শয়তানের কারসাজি আছে, সে কথা শয়তানের জবানীতে কবি এই কবিতার মুখবন্ধে[৫] বলেছেন–

"যুগে যুগে কেমনে
কোথায় কোন্ মায়াজাল পাতি রেখেছে
সে আদমের বংশ ধ্বংস তরে, কিভাবে
সত্য, ন্যায়, সুন্দরের আদর্শ হইতে
মানুষেরে ভুলাইয়া বিপথে আনিয়া

---

১. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২. গোলাম মোস্তফার 'বনি আদম' কাব্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৩. দেওয়ান আব্দুল হামিদ, পল্লী কবি রওশন ইজদানী, মাহে নও, পৌষ সংখ্যা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
৪. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৫. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

ঘটাইছে তার মৃত্যু–নৈতিক পতন,
রোজ–কিয়ামৎ তক্ আর কোন্ খেলা
খেলিবে সে, আনিবে সে কোন্ অভিশাপ্,
সে কথা লিখিতে হইবে মোরে।"
পক্ষান্তরে
"আদমের আওলাদ–মানব–সমাজ
হারানো বেহেশ্‌ত্ তার পুণর ধিকার
কবিবার কতটুকু করেছে প্রয়াস;
শয়তানের কারসাজি–চক্রান্ত–কৌশল
ব্যর্থ করে কোন্‌খানে কোন্ মহাবীর
হয়েছে বিজয়ী;ভবিষ্যৎ রণসজ্জা,
অস্ত্রবল, মনোবল, রসদ–সম্ভার,
শক্তি আর সম্ভাবনা–কি আছে তাহার,
কেমনে সে চালাইবে তার অভিযান,
কোথা তার সেনাপতি, কোন অস্ত্র আজো
সঞ্চিত রয়েছে তার তূনে, কিবা তার
রণনীতি– বলিতে হইবে তাও মোরে।"[১]

গোলাম মোস্তফা 'বনি আদম'এ আদম সৃষ্টি কি করে হল তা প্রথমে বর্ণনা করে পরে বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গিনী কি করে জন্ম লাভ করল। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কি করে আদম মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র 'খলিফা' পদ পেলেন। আর অপর দিকে অন্ধ অহঙ্কারে ইবলিশ আদমকে স্বীকৃতি না দিয়ে বিদ্রোহী শয়তান হয়ে গেল। সেই দিন থেকে শয়তানের সঙ্গে মানুষের চিরন্তণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটল। আমরা জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়ে নিষিদ্ধ ফল আদম ও হাওয়াকে খাওয়ায় ইবলিশ। তারই ফল শ্রুতিতে বেহেশতের অধিকার হারিয়ে আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে নেমে আসতে বাধ্য হয়। কবি বলেছেন–

"----------নতুন করিয়া
শুরু হলো এই খানে সেই পুরাতন
প্রতিযোগী সংগ্রাম।" [২]

কবি গোলাম মোস্তফা এই কাব্যটি লিখতে গিয়ে ইসলাম এবং খ্রীষ্টিয়

১. গোলাম মোস্তফা রচিত 'বনি আদম' কাব্য গ্রন্থের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য
২. খন্দাকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মতের মধ্যে যে দারুণ পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআন–হাদীসকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। বাইবেলে ইভ্ শয়তানের দ্বারা প্রথম প্রলুব্ধ হয় এবং সে–ই প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে। পরে সে আদমকে ফল খাওয়ার ব্যাপারে নির্দোষ বানিয়েছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে নারীর জন্যই সমগ্র মানব জাতির পতন ঘটেছে। কিন্তু ইসলাম এই কলঙ্ক ও অমর্যাদা হতে নারী জাতিকে রক্ষা করেছে।[১] কুরআনে আছে– "এবং শয়তান তাহার নিকট (আদমের নিকট) কুপ্রস্তাব করিল, হে আদম আমি কি তোমাকে অমরতা বৃক্ষের কাছে এবং অনন্তকাল স্থায়ী রাজ্যে লইয়া যাইব? তখন তাহারা উভয়েই সেই ফল ভক্ষণ করিল এবং তাহার কু প্রস্তাবগুলি তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল এবং উভয়েই গাছের পাতা দিয়া নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। এই রূপে আদম তাহার প্রভূর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং কাজেই তাহার জীবন দুঃখময় হইল।"[২]

গোলাম মোস্তফা এই সকল তথ্য উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন–"এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আদমই প্রথম প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সে–ই আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করার ব্যাপারে প্রধানত দায়ী ছিল।শয়তান যে হাওয়ার নিকটেই প্রথম কুপ্রস্তাব করিয়াছিল এবং হাওয়াই যে প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া পরে আদমকে দিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন– এরূপ কথা কুরআন শরীফের কোথা ও নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ব্যাপারে আদমই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আদর্শ স্ত্রীর ন্যায় হাওয়া শুধু স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিল মাত্র। কুপ্রস্তাব করিবার বেলায় প্রথমে আদমের নাম এবং পরিণাম ফলের বেলায় 'এইরূপে আদম তাহার প্রভূর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং তাহার জীবন দুঃখময় করিয়া তুলিল' বলায় এই অনুমানই অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই নারীই যে সমগ্র মানব জাতির পতনের মূল এবং পাপের প্রথম উৎস এই কথা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। ইসলাম নারীকে দিয়াছে মহিমাময়ীর রূপ।[৩]

বনি আদম কাব্যের 'মুখবন্ধে' কবি বলেছেন–,"'বনি–আদম' কাব্যে

---

১. খন্দাকার আব্দুল মোমেন(সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২. আল কোরআন, সুরা ত্বোয়া'হা, আয়াত–১২০, ১২১

৩. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১–৬২

Dhaka University Institutional Repository

অমিত্রাক্ষর পয়ার–ছন্দে আমি কিছু নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করিয়াছি।[১] এই কবিতার সঙ্গে জন মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট' কাব্যের সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিকে এবং ভাষার বর্ণনায় গোলাম মোস্তফা মূলতঃ ইসলামী ঐতিহ্য অনুসরণ করে সম্পূর্ণ কবিতাটি নির্মাণ করেছেন।[২] কাব্য গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় কবি আব্দুল কাদির গোলাম মোস্তফার হৃদয়গ্রাহী ছন্দ–প্রকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩] প্রকৃত পক্ষে কুরআন শরীফের সূরা আল বাকারা–এ আদম সৃষ্টির কাহিনীটি বনি–আদম কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

আল্লাহ্ কন ঃ "আমি এক। সর্ব–শক্তিমান।
তবু মোর খলিফার আছে প্রয়োজন।
পরম নির্গুণ রূপে চির সুপ্ত হয়ে
থাকিতে চাহিনা আমি আমার মাঝারে
সে হবে কাণ্ডারী, তারি স্বর্ণতরী বেয়ে
অসীম নামিয়া যাবে সীমার মাঝারে,
সীমা সে মিশিবে এসে অসীমের ধারে।"[৪]

ম. মীজানুর রহমান কবির 'বনি আদম' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন–"গোলাম মোস্তফা মূলত ইসলামী ভাবধারায় কাব্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাব্য বৈচিত্র্যে 'বনি আদম' কবিতাটি খুবই উন্নত মানের। বলা যায়, গোলাম মোস্তফার কাব্য গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭১, সম্পাদিত ও গ্রন্থিত কাব্য–গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।"[৫]

ডঃ খালেদ মাসুকে রসূল এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–"গোলাম মোস্তফা তাঁর অনেক কবিতায় ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন তাঁর 'বণি আদম' কাব্যে। মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে অমরত্ব লাভ করেছেন কিন্তু

১. দ্রষ্টব্য ঃ গোলাম মোস্তফা: কাব্য গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)
আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বইটির মুখবন্ধ।
২. ঐতিহ্য (পত্রিকা)ঃসম্পাদক অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম,
ম–মীজানুর রহমানঃ গোলাম মোস্তফার কবিতা,
জুলাই–ডিসেম্বার ১৯৯৭, ১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা, পৃ. ৫৩
৩. দ্রষ্টব্যঃ গোলাম মোস্তফা: কাব্য গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)
আব্দুল কাদির সম্পাদিত, আব্দুল কাদির রচিত 'ভূমিকা'।
৪. গোলাম মোস্তফা, কাব্য গ্রন্থ (প্রথম খণ্ড), আব্দুল কাদির সম্পাদক,
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৩৩৩
৫. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য,
জুলাই–ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৯৭, ১২ বর্ষ ৭–১২ সংখ্যা), পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরসুরীরা আজ পর্যন্ত এ ছন্দের অন্তর্নিহিত কলা-কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারেননি। গোলাম মোস্তফা অমিত্রাক্ষর ছন্দের এ শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই এ ছন্দের গভীরে প্রবেশের একটা ব্যাকুল আকাঙ্খা তাঁর ছিল। 'বণি আদম' কাব্যে এ ছন্দ নিয়ে তাই তিনি নতুন করে পরীক্ষা চালিয়েছেন।"[১]

সৈয়দ আলী আহসান গোলাম মোস্তফার কবি প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন-"বাংলা কবিতায় যে সময় পাশ্চাত্যের নাস্তিকতার নৈরাজ্য বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছিল সে সময় গোলাম মোস্তফা একটি ধর্ম বিশ্বাসের চেতনা কাব্য ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন। যার ফলে পরবর্তীতে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব সহজ হয়েছিল। বলা যায়, গোলাম মোস্তফার সময়কাল হচ্ছে ১৯২০ থেকে ১৯৬০। তাঁর 'রক্তরাগ' যেটি তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ সেটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে এবং সর্বশেষ কাব্য গ্রন্থ 'বনি আদম'প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। সুতরাং ১৯২০ থেকে ১৯৬০এই সময়কালটা ঠিকই আছে। গোলাম মোস্তফার সমসাময়িক কবিগণ হারিয়ে গেছেন বললেই হয়, যেমন শাহাদাত হোসেন এবং বেনজির আহমদ। কিন্তু গোলাম মোস্তফাকে এখনও স্মরণ করা যায় এবং এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।"[২]

১. ডঃখালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার কথা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

গোলাম মোস্তফার রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামী ভাবধারা। তিনি কখনোই এই আদর্শ হতে বিচ্যুত হননি। তিনি সার্বিকভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন, যাতে তাঁর লেখনির মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারা বিকশিত হয়। তাই তিনি সর্বত্রই বিজাতীয় সংস্কৃতি বর্জন করেছেন। তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু কুৎসা রচনা করেননি। তাঁর কোন উপন্যাসে কোন হিন্দু চরিত্র স্থান পায়নি।[১] রূপের নেশা, ভাঙাবুক,একমন একপ্রাণ, তার রচিত উপন্যাস।[২]

গোলাম মোস্তফার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস রূপের নেশা। উক্ত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালে। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি তখন কলিকাতা রিপন কলেজের বি এ ক্লাসের ছাত্র।[৩] মুসলিম সাহিত্য সাধকেরা তখনও মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হননি। ইতিপূর্বে রচিত আনোয়ারা, বংকিম দুহিতা, রায় নন্দিনী, তারা বাঈ, নুরুদ্দীন প্রভৃতি উপন্যাস রোমান্টিক ধর্মের। এ সব উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা লেখকেরা করেননি। মুসলিম বাংলায় একমাত্র গোলাম মোস্তফাই মনস্তত্ত্বমুলক উপন্যাস রচনায় প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা সাহিত্য জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে। গোলাম মোস্তফা তাদের দ্বারাই উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[৪]

গোলাম মোস্তফা প্রধাণত কবি। তাই উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সর্বত্র আবেগ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাঁর কবিত্বের এ উচ্ছ্বাস শিল্পকে খুব বেশী আচ্ছাদিত করেছে। গোলাম মোস্তফার উপন্যাসের ভাষা আবেগ বিহ্বল রোমান্টিকতায় উজ্জীবিত এবং কবিতত্বময়। বাস্তব জীবনে

---

১. ডঃ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃ. ৪৫

২. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, প্রকাশকঃ অধ্যাপিকা শামসুন নাহার লিলি, বারন্দীপাড়া কদমতলা, যশোর, ১৯৮৭ইং, পৃ. ১০০

৩. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ইং, পৃ. ৪৭

৪. ডঃ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

এই তিনটি জিনিস স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করে। উপন্যাসের আবেগধর্মী ভাষা সৃষ্ট চরিত্র পরিস্ফুটনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রূপের নেশা এবং ভাঙ্গাবুক উপন্যাসের চরিত্রগুলো তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগ ভারাক্রান্ত।[১]

রূপের নেশা উপন্যাসে তিনি কতগুলো কাব্যিক উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন যা উপন্যাসের নায়করূপের নেশায় বিমুগ্ধ হয়ে উচ্চারণ করেছে। তা হলো–"রূপ! রূপ! রূপই মন। সৃষ্টি ব্যাপিয়াই রূপ। নিখিল ভুবনে দিকে দিকে স্তরে স্তরে রূপ। আকাশে রূপ পাতালে রূপ। রূপ ছাড়া কি আছে? ---- " আকাশে চাঁদ হাসে, তারা ফোটে, অমনি নিখিল জগতে রূপের তরঙ্গ উঠে। সকলই তো রূপ। রূপ ছাড়া কি আছে? রূপের শিখায় তুর পাহাড় চূড় হইয়া গেল, তবও বলি রূপ কিছু না।" [২]

উক্ত উদ্বৃতি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর গদ্যে কাব্যিক আমেজ ও ইসলামী ভাবধারা সমানভাবে রয়েছে। উক্ত উপন্যাসে তিনি ইসলামের তাছাউফ বা সুফীবাদ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। যা তিনি উপন্যাসের নায়ক রশিদের উক্তিতে বিবৃত করেছেন এভাবে–"তাছাউফকে আমি অন্তর হতে বিশ্বাস করি। প্রত্যেক জিনিসের যখন বহিরঙ্গ (Enoteric) ও অন্তরঙ্গ (Exoteric) বলে দুটো ভাগ আছে। বহির্জগৎ ছাড়া অন্তর্জগৎ বলেও যখন আর একটা জগত আছে। তখন তাসাউফকে কেন বিশ্বাস করবো না? তাছাউফকে আমি ইসলামের অন্তর্জগৎ মনে করি। কর্মের মধ্যে ভাব যেমন, ইসলামের মধ্যে তাছাউফ তেমন।"[৩] এ ছাড়া ও উপন্যাসটিতে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদি রয়েছে। যা একজন মুসলিমের করণীয় পালনীয় তার উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে।

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "ভাঙাবুক" প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালে। এই উপন্যাসটিতেও তিনি গদ্যের মধ্যে নায়ক নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে আবেগ তাড়িতভাবে বলছে। "সুফিয়া! প্রাণের সুফিয়া, তুমি আজ কোথায় ! বাল্যকালের খেলার সাথী সুফিয়া! জীবনপথের আকাঙ্খিত সহযোগিনী সুফিয়া!

১. ডঃ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
২. গোলাম মোস্তফা, রূপের নেশা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩২৬ বাং, পৃ. ৬৪.
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া! আমার সাধনা, আমার কামনা আমার ভালোবাসা সুফিয়া কোথায় তুমি----------।"[১]

এই উপন্যাসটিতে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন।

এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা সওগাত – এ আলোচনা প্রসঙ্গে লিখা হয় যে, "আমরা গোলাম মোস্তফা সাহেবের 'রূপের নেশা' পড়ে মোটেই বিহবল হই নাই। কিন্তু ভাঙাবুকের তপ্তদীর্ঘশ্বাস আমাদের প্রাণের তন্ত্রীগুলিকে এলোমেলো করিয়া দিয়াছে। ভাঙাবুকের আখ্যান বস্তুতে মনোহারিত্ব আছে, কিন্তু চমৎকারিত্ব নাই।"[২]

গোলাম মোস্তফা ভাঙাবুক উপন্যাসের পটভূমি বিশ্লেষণে লিখেছেন–"ভাঙাবুক সে যুগের পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছিলেন। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস তখনকার দিনে (১৩২৮, প্রথম সংস্করণ) মুসলিম সমাজে ছিল না বলিলেই হয়। আমার তখন নতুন হাত ও নতুন চিন্তা। নতুন উদ্যম বলিয়া তাই উপন্যাসখানি খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।"[৩]

কবি জসীম উদ্দীন লিখেছেন–" কবি যে কালে এই পুস্তক রচনা করেছিলেন সেকালে কোন মুসলিম যুবকের পক্ষে অন্য নারীর সান্নিধ্যে আসা খুবই কঠিন ছিল।"[৪]

গোলাম মোস্তফার নিকট আদর্শই ছিল মূখ্য। তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী আদর্শকে শুদ্ধরূপে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই আদর্শিক স্বাতন্ত্রের জন্যই তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহ সুখপাঠ্য হয়েছে। তিনি গদ্য এবং কবিতা উভয় রচনাতেই সিদ্ধহস্ত হলেও আবেগানুভূতির অভিব্যক্তিতে তিনি মূলত–ই একজন কবি। এ কারণেই পদ্যের মত্য গদ্য রচনাতেও আমরা কম বেশি কবি গোলাম

১. গোলাম মোস্তফা, ভাঙাবুক, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা – ১৯৬৮ইং, পৃ. ১৩
২. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৪. প্রেক্ষণ,ত্রৈমাসিক পত্রিকা (সাহিত্য), সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মোমেন, বর্ষ ১ সংখ্যা ২ [এপ্রিল –মে–জুন ১৯৯৮], পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

মোস্তফার উপস্থিতি দেখতে পাই। তিনি কবি হিসেবে বড় না গদ্য শিল্পী হিসেবে বড়, সে বিচারে না গিয়েও বলা যায় যে, গোলাম মোস্তফা গদ্য চর্চা করতে গিয়েও প্রয়োজন মতো তাঁর কবিত্ব প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন।"[১]

এ সম্পর্কে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন–"মরহুম গোলাম মোস্তফার সম্পূর্ণ নাম কবি গোলাম মোস্তফা। লোকের স্মৃতিতে 'কবি' তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অদ্যাংশরূপে চিরকাল জাগরক থাকবে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য কীর্তির বিচারের এই পরিচয় অসম্পূর্ণ। কবির গদ্য রচনার গুণ ও পরিমাণ। কোন অর্থেই সামান্য নয়। এমনকি এই গদ্যের কবিত্বপূর্ণ এক বিশেষ ওজস্বিতার তারিফ করেই যারা ক্ষান্ত হন তাঁরাও সুবিচার করেন এমন বলতে পারিনা। কারণ, গোলাম মোস্তফার গদ্য যে কেবল কাব্যিক উদ্দমতায় বেগবান তাই নয়, এই গদ্য পরিণত চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে সরস, শান্তি ও সংহতরূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম।" [২]

নাসির হেলাল গোলাম মোস্তফার উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন যে, "গোলাম মোস্তফার কাছে মূখ্য হলো, আদর্শ এবং মুসলিম কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের চেতনা। Art for arts sake চেতনাটি তাঁর কাছে গৌণ। এ কথা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কারণ কবি গোলাম মোস্তফা যেকালে সাহিত্য রচনা করেছেন সেকালে একজন মুসলিম যুবক-যুবতীর কতটুকু স্বাধীনতা ছিল তা দেখার বিষয় রয়েছে। তিনি প্রেমের কবিতায় যেভাবে তাঁর প্রেয়সীকে দেখেছেন সেটা Art for arts sake এর জন্যেই সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে উপন্যাস দুটিতে নায়ক যে আবেগভরে নায়িকাকে সম্বোধন করে কথা বলছে, সেটাও ঐ Art for arts sake - এর কারণেই হয়েছে। নইলে কোন মুসলিম লেখকের পক্ষে সেই যুগে ঐ ভাবে কথা বলা সম্ভব ছিলনা। অতএব বলতেই হবে কবি গোলাম মোস্তফা মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে আধুনিকতার পথিকৃত।"[৩]

---

১. ঐতিহ্য (পত্রিকা), সম্পাদক অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম,
১২ বর্ষ, ৭–১২ সংখ্যা, জুলাই – ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং, পৃ. ৮০

২. মুনীর চৌধুরী, কবির চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি,
(প্রবন্ধ) কবি গোলাম মোস্তফা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন,
১৯৬৭ইং, পৃ. ৮৪

৩. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সাহিত্য ও পাঠ্য বই রচনায় ইসলামী ভাবধারা

গোলাম মোস্তফার পেশা ছিল শিক্ষকতা। তিনি আজীবন শিক্ষক হিসেবে ছাত্র–ছাত্রীদের কোমল মন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। "শিক্ষা বিজ্ঞানের ডিগ্রীপ্রাপ্ত বহু কালের বহুছাত্রের জীবন জ্ঞানলব্ধ এই কবি প্রাইমারী ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শেণীর পাঠ্য গ্রন্থ রচনায় সফলকাম ছিলেন। ছোটদের মানস গঠন উপযোগী অসংখ্য রচনা দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনা শিশুদের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণীয় ছিল। এ সব রচনার ভাব, ভাষা, ছন্দ সবই শিশু মনোরঞ্জনকারী। জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর অধিকাংশ স্কুল পাঠ্য বইয়ের নামের সাথে 'আলো' শব্দটি সংযোগ করেন।"[১]

গোলাম মোস্তফার শিশু বিষয়ক রচনা সম্পর্কে আলমগীর জলিল বলেন– "পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে তিনি একদিকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেন। অপর দিকে দেশ–বিদেশের নাবাবিধ জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ শেখাবার ব্রত নেন। ইতিহাস ছিল তার অত্যন্ত প্রিয়। সে কারণে ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে গদ্যে–পদ্যে সহজ ভাষায় ছোটদের জীবন গঠনের সাহায্যকারীরূপে উপস্থাপিত করেন। শিক্ষক–কবি গল্পের মাধ্যমে ছন্দের ললিত ভঙ্গি সহযোগে আদর্শ জীবনের ব্যাখ্যা সম্বলিত যে পাঠ্য গদ্য–পদ্য রচনা করেছেন, তা শিশু সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে মর্যাদা সম্পন্ন।"[২] অর্ধশতাব্দীকাল কবি গোলাম মোস্তফা সাহিত্য সাধনা করেছেন। এই পুরো সময়টাই তিনি শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানকে অগ্রসর করার জন্য, ঘুমিয়ে পড়া অর্ধচেতন অচেতন আপন সম্প্রদায়ের জাগরণের জন্য হ্যামিলনের বংশীবাদকের কলমের বাঁশী বাজিয়ে গেছেন।[৩] এ ব্যাপারে গোলাম মোস্তফা স্বয়ং লিখেছেন–

---

১. আলমগীর জলিল, শিশু সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক, ইসলামিক ফাউন্ডেশব বাংলাদেশ, ১৯৮৮ইং, পৃ. ১০৪

২. আলমগীর জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৩. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী ১৯৯৮ইং, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

"কবিরা শুধু স্রষ্টাই নন–দ্রষ্টাও। অনাগত যুগের পদধ্বনি শুনতে পান। জাতি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কবি আসে নকিবের বেশে, মোয়াজ্জিনের বেশে আলোর আজান দিতে কওমের ঘুমন্ত আত্মায় আগুন ধরাতে কণ্ঠে ভাষা দিতে, বাজুতে কুয়ৎ দিতে, চোখে নব নব আশার স্বপ্ন দিতে। কবির কাব্যে তাকে কওমের আজাদি ইশারা–আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যুগে যুগে নবীরা যে কাজ করে যান ধর্মের দিক দিয়ে। কবিরা করে যান তাই তাহ্জিব–তমুদ্দুনের দিক দিয়ে জাতির স্বপ্ন সাদ ও আশা আকাঙ্খার দিক দিয়ে। সত্যিকারের কবিরা তাই যুগস্রষ্টা। এদের কাব্যে ও গানে জামানার মোড় ঘুরে যায়।"[১]

আসলেই কবি গোলাম মোস্তফা স্রষ্টা ও দ্রষ্টার কাজ করে গেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিক্ষক ছিলেন, সে ক্ষেত্রে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।[২] তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন –

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে, যে কারণে আগামী দিনের এই শিশুদের জন্য তিনি রচনা করেন পর্যাপ্ত পরিমাণ ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি তিনি জাতি গঠনের লক্ষ্যে রচনা করেছেন বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক। এ সম্পর্কে আলমগীর জলিল লিখেছেন –

" মুসলমান কবিদের মধ্যে সেকালে ছন্দ সাহিত্যে একমাত্র গোলাম মোস্তফাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি কবি নজরুলও ছন্দ সৌকর্যে এমন দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থন হননি। এ কারণে গোলাম মোস্তফার কবিতাকে অনেক পন্ডিত পদ্য ছাড়া কিছু বলতে অস্বীকার করেন। এমন মিল, ছন্দোচাতুর্য ও গতিময় উচ্ছ্বাস সে যুগে মুসলমান শিশু সাহিত্যিকদের কারো মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়নি।"[৩]

গোলাম মোস্তফা শিশু–কিশোরদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর নিরীক্ষণ করেন। শিশু–কিশোরদের উপযোগী কবিতা রচনা করে প্রথম জীবনে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত কিশোর কবিতাটি জীবনের প্রথম খ্যাতি

১. সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী ঃ বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ইং, পৃ. ১৪৭.

২. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭.

৩. আলমগীর জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫.

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। কবিতাটি তৎকালীন স্কুল পাঠ্য বইয়ে সংযোজিত হয়। কিশোরদের উপযোগী এত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় রচিত কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুবই বিরল। কবিতাটিতে কবি লিখেছেন –

" আমরা কিশোর, আমরা কচি, আমরা বনের বুলবুলি,
সবুজ পাতায় শয্যা রচি, হাওয়ায় দোলায় দুলদুলি!
ঊষার আলোয় স্নান করি
নিত্য নূতন তান ধরি,
সহজ তালে পাখনা মেলে উড়ে চলি চুলবুলি।
আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি নিখিল বন–নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে ।
লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে।" [১]

এ সুদীর্ঘ কবিতাটি ১৯২২ সালে তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি তখন ব্যারাকপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। কবিতাটি সম্পর্কে গোলাম মোস্তফা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন –

"একদিন হেড মাস্টার বেণীবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মোস্তফা সাহেব আপনাকে একটি লেখা দিতে হইবে। গতকল্য আমি কোলকাতায় গিয়েছিলাম। 'কিশোর' পত্রিকার সম্পাদকের সংগে দেখা। তিনি একটি কবিতা চাহিয়াছেন আপনি একটি কবিতা দেবেন।আমি আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইলাম। বাসায় ফিরিয়া ভাবিলাম, কিশোর সম্পর্কেই একটি কবিতা লিখিব। চারি পাঁচ দিবস পরে কবিতাটি লিখিয়া লইয়া বেণীবাবুর নিকটে গেলাম এবং আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। বেণীবাবু গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি কবিতাটির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরদিন বেণীবাবু কলিকাতা হইতে কিশোর সম্পাদকের একখানি পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা আমার হাতে

১. গোলাম মোস্তফা, রক্তরাগ কাব্যগ্রন্থ (প্রথম খন্ড),
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা– ১৯৭২ইং, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন। পত্রখানি সংক্ষিপ্ত । তাহাতে এইরূপ লিখা ছিলোঃ

প্রিয় মুস্তফা সাহেব,

"আপনার কবিতার জন্য ধন্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিধি মাপিলে হয়তো তিন মাইল লম্বা হইয়া যাইবে। কিন্তু দীর্ঘ পরিধিরি মধ্যে ও একটি কবিতা তাঁহার নাই যাহা কিশোর মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। আমি ভবিষ্যদ্বানী করিতেছি । এই কবিতা আপনাকে অমর করিয়া রাখিবে। চিঠিখানি পড়িয়া প্রীতি লাভ করিলাম।"[১]

কিশোর সম্পাদকের ভবিষ্যদ্বানী সত্যি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন শিশুদের জন্য ' নতুনকুঁড়ি' নামের একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এ অনুষ্ঠানটি শুরুর পূর্বে "আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি"– এ গানটি গাওয়া হয়।

১৩৩৫ বঙ্গ বান্দের 'বার্ষিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় গোলাম মোস্তফা শিশুদের উপযোগী 'মহাযুদ্ধের ফলাফল' নামক একটি সংক্ষিপ্ত 'একাংক রস নাটিকা' লেখেন। নাটিকাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটি দৃশ্যে বিভক্ত। নাটিকাটি হাস্যরসাত্মক হলেও একটি গভীর জীবন সত্য এবং বাস্তবতা এর মধ্যে প্রস্ফূটিত হয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের জীবন অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল। নাটিকাটির পাত্র–পাত্রী, নর–নারী নয়–মশা–মাছি, ছারপোকা ও মানুষ।[২] নাটিকাটি ছিল এরূপ –মানুষের অত্যাচারে একবার মশা, মাছি ও ছারপোকা অতিষ্ট হয়ে উঠল। মশা মানুষের গায়ে বসতে গেলে তাড়া করে, মাছি খাদ্যে বসতে গেলে তাড়া করে, ছারপোকা যে তক্ত পোষে বাসা বেধেঁছিল মানুষ তার বাসা ভেঙ্গে দিল। তাই এই তিন প্রাণী একত্র হয়ে তাদের রাজাদের নিয়ে এক অধিবেশনে মিলিত হল। মশারাজ এনোফিলিস বলল–

১. বন্দে আলী মিয়া, কবি গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা– ১৯৮৬ইং, পৃ. ৩৭

২. মজির উদ্দিন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, পৃ. ৫২৩

Dhaka University Institutional Repository

"এক কাজ করতে হবে। আমাদের তিন দলকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যখন যার সুবিধা হবে তখন সে মানুষকে আক্রমণ করবে। মাছি দিনের বেলায় মানুষের খাবারে আক্রমণ করবে আর চিঠি লেখার সময় ও ঘুমানোর সময় নাকে চোখে বসে বিরক্ত করবে। রাত্রিতে তারা বিশ্রাম নেবে। রাত্রির কাজ মশা ও ছারপোকার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। কারণ রাত্রি জেগে নাইট ডিউটি করতে এরা খুব মজবুত। মানুষ রাতে যখন ঘুমাবে তখন মশা উপর থেকে আর ছারপোকা নীচে থেকে আক্রমণ চালাবে। এইরূপ–দিবারাত্রি কোন সময়ই আক্রমণের বিরাম থাকবে না। দেখি মানুষ কি করে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মশা, মাছি, ছারপোকা রোগ ব্যাধি এনে আর অত্যাচার করে মানুষকে ধ্বংস করতে লাগল। মানুষ যখন এই তিন প্রাণীর নিকট পরাজিত হল তখন তারা সমস্বরে উঠল –

'বিজয় বীরের বেশে
চল চল সব দেশে
মানুষ মেরে মশা মাছির
রাজ্য বসাও।"[১]

শিশু–কিশোরদের পাঠ উপযোগী গোলাম মোস্তফা লিখিত অনেক লিখা তৎকালীন 'আল এসলাম,' 'বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'সওগাত ' 'মোসলেম ভারত,' 'সহচর,' 'সাম্যবাদী', 'সাহিত্যিক,' 'নওরোজ,' 'মোহাম্মদী, 'জয়তী' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "১৩২৫ সালের আল এসলাম 'পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গোলাম মোস্তফার 'ছুটির আহবান, পল্লী বালিকার কলিকাতা বিরাগ প্রভৃতি কবিতা। প্রায় সমসাময়িককালেই কিশোরদের উপযোগী তাঁর কিছু ছোট গল্পও আত্মপ্রকাশ করে।'খোকা' শীর্ষক গল্পটি প্রকাশিত হয় সহচর পত্রিকায় ১৩৩০ সালে।"[২]

গোলাম মোস্তফার অনেক কবিতা, রক্তরাগ, খোশরোজ, কাব্য কাহিনী, বুলবুলিস্তান ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। নানাবিধ মিল চাতুর্য ও নতুন নতুন ছন্দ তৈরী করে তিনি কবিতা রচনা করতেন। "কাব্য কাহিনী" কাব্য

১. এ জামান, যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার (প্রথম খন্ড), প্রকাশক, এ, বি, এম, আশরাফ উজ্জামান, লতিফ মঞ্জিল, নওয়াপাড়া রোড, ঘোপ, যশোর–১৯৯৮ইং, পৃ. ১৭৬
২. মুহম্মদ মাহফুজ উল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে অনেক অপ্রকাশিত ছোটদের কবিতা রয়েছে। গোলাম মোস্তফা শিশু–কিশোরদের শিক্ষাদান এবং তাদের জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যই কেবল রচনা করেননি, বরং অনক চিন্তামূলক রচনা উপহার দিয়েছেন। ১৩২৯ সালে তিনি "শিশুর শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক গঠনমূলক আলোচনা করেন। তিনি মৌলিক কবিতা রচনা ছাড়াও অনেক ইংরেজী, আরবী, ফারসি কবিতা শিশুদের উপযোগী ভাষায় রচনা করেন।

কবি তার প্রত্যাশা ও বিশ্বাসকে শিশু–কিশোরদের মাঝে তুলে ধরেছেন শিশুতোষ কবিতাবলীর মাধ্যমে। গীতিকবিতার ভাষায় কবি শিশুদের স্বপ্ন দেখান কবিতার মাধ্যমে। কবি লিখেছেন–

"জাগবে সাড়া বিশ্বময়
এই বাঙালী নিঃস্ব নয়।
জ্ঞান গরিমা শক্তি সাহস
আজও এদের হয়নি ক্ষয়।"[১]

গোলাম মোস্তফা আরবী ছন্দের সূত্রগুলো বাংলা অনুবাদ করেন যার সাহায্যে বাংলা শিশু সাহিত্য সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে। তিনি সব বিষয়েই ছন্দ মিলাতে সক্ষম ছিলেন। মানুষের নামের মধ্যেও যে একএকটি ছন্দ রয়েছে তা তিনি আবিষ্কার করেন। যেমন– তাঁর ছোট্ট শালাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন–

"তোজাম্মল ছোকড়া
দাঁত পড়া বোকড়া
হাড়ে হাড়ে দুষ্ট,
সবাই তাতে তুষ্ট।"[২]

তিনি বাংলা ছন্দ নিয়ে ছান্দসিকের ন্যায় অনেক পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন। তাই তাঁর প্রতিটি কবিতাই প্রাঞ্জল হয়ে ধরা দিয়েছে। গোলাম মোস্তফা

১. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত পৃ. ১১৪
২. শিল্পী মোস্তফা আজিজ,
কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা– যশোর সমিতি, ঢাকা দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

শিশু–কিশোর উপযোগী অনেক কবিতার ছন্দ ছড়া রচনা করেছেন। যেমন–

"বাহাদুর শাহ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল
চিতোর রাণী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়–
রাজপুতানা আতঙ্কে টলমল।"[১]

"খুকু মনি জনমনিল যেদিন মোদের ঘরে
পরীরা সব দেখতে এল কতই খুশী ভরে।
আদর করে দুধ খাওয়ালো সোনার পিয়ালাতে
দোলা দিয়ে ঘুমপাড়ালো জোছনা মাখা রাতে।
ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে হাত ধরে সব তায়'
কতই খেলা খেলল তারা ফুলের বিছানায়।"
[খুকু মনি– সবুজ সাথী, ১ম ভাগ]

"নূরু, পুশি, আয়েশা, শফী সবাই এসেছে,
আম বাগিচার তলায় যেন সবাই হেসেছে
রাঁধুনীদের শখের রাঁধার পড়ে গেছে ধুম
বোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।"
[বনভোজন– সবুজ সাথী, ২য় খন্ড]

"এই করিনু পণ মোরা এই করিনু পণ
ফুলের মত গড়ব মোরা মোদের এ জীবন।
হাসব মোরা সহজ সুখে
গন্ধ রবে লুকিয়ে বুকে,
মোদের কাছে এলে সবার জুড়িয়ে যাবে মন।"
[শিশুর পণ– সবুজ সাথী, ৪র্থ ভাগ]

"পালকি চলেরে
পালকি চলেরে
ঘোমটা ঘেরা কে

১. গোলাম মোস্তফা, বুলবুলিস্তান, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৯, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

বউ–ঝি টলে রে!
খোট্টা বেহারা
চোট্টা চেহারা
কোন গাঁ হতে গো।
আসছে ইহারা।"
[উড়ে বেহারা– রক্তরাগ]
"শুট্‌কী মাছের সুখটি পাব
নোয়াখালী চাটগাঁতে।
রাজশাহীতে মিষ্টি খাব
আম খাবভাই মাল দাতে
দিনাজপুরে চিড়া খাব
বগুড়াতে দৈ মাখি।
পাকিস্তানের অভাব কী॥"[১]

[পাকিস্তানের অভাব কী?]

গোলাম মোস্তফাকৃত সুরা ফাতেহার ভাবার্থবোধক কাব্যানুবাদ 'স্তোত্র' [সওগাত মাঘ ১৩১৫]

"অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী।
যতো গুণগান, হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।"[২]

অনুবাদের মাধুর্যে ও বাণীর মোহনীয়তায় মৌলিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। 'সওগাত' এ মুদ্রণকালে ব্রাকেটে বলা হয়েছিল, সুরা ফাতেহার ভাবার্থবোধক কাব্যানুবাদঃ রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার পরে,– গানের অনুরূপ সুর।" [৩]

---

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫–৯৬
২. গোলাম মোস্তফা ঃ কাব্য গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭২ ইং, পৃ. ২৭১
৩. নাসির উদ্দিন, (সম্পাদক) সওগাত, মাঘ সংখ্যা –১৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শিশুদের জন্য অসংখ্য অসাধারণ গদ্য ও রচনা করেছেন। যেমন–

"অসীম তোমার করুণা।তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছএবং অন্যান্য প্রাণী ও পদার্থকে আমাদের অধীন করিয়া দিয়াছ। তোমার চন্দ্র সূর্য প্রতিদিন আমাদিগকে আলো দান রে, তোমার বায়ু আমার শরীর জুড়ায়, তোমার নদীর পানি আমাদের তৃষ্ণা মিটায়, এই যে চাঁদের আলো, ফুলের হাসী, পাখির গান; এই যে আসমান, জমিনে এত শোভা, এত রূপ–এ সমস্তই আমাদের সুখ ও আনন্দ দানের জন্য। এই করুণার জন্য আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।"[১]

২. ক্রমে জাহাজ নির্মাণ শেষ হইয়া গেল। অবশেষে একদা হজরত নূহের (আঃ) বিবি রুটি সেকিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, উনান ফাটিয়া গরম জল উঠিতেছে। ব্যাপার দেখিয়াই তিনি স্বামীকে আসিয়া ঐ কথা কহিলেন। তখন হজরত বুঝিতে পারিলেন যে, সেই শাস্তির দিন আসিয়াছে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালার আদেশে হজরত নূহ (আঃ) তাঁহার পরিবারবর্গ ও উম্মতগণকে জাহাজে তুলিয়া লইলেন এবং রাজ্যের যত জীব–জন্তু, পশু–পক্ষী প্রভৃতির এক এক জোড়া করিয়া সঙ্গে লইলেন।

এ সকল ছাড়া হজরত নূহ (আঃ) যত প্রকার বৃক্ষলতা আছে তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি বীজও নিজের কাছে রাখিলেন।"[২] (ইসলামী নীতি কাহিনী– পৃ. ২৮)

উক্ত কবিতা ও গদ্যাংশের উদ্ধৃতি থেকে বলা যায় যে, গোলাম মোস্তফা প্রকৃতই একজন স্বার্থক শিশু সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যের দ্বারা শিশু মনে ছন্দের দোলা লাগবে এবং এর সহায্যে শিশু ইসলামের বিষয়াবলী অবগত হবে।

তৎকালে গোলাম মোস্তফা লিখিত বিভিন্ন কবিতার উল্লেখযোগ্য চরণ প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ছেলে–বুড়োদের মুখে মুখে ফিরত। যেমন–

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সবশিশুরই অন্তরে। শিশুদের জন্য রচিত 'রাখাল খলিফা' কবিতাটিও এককালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবিতাটির

১. আলমগীর জলিল,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯– ১১০

২. আলমগীর জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

অংশ বিশেষ নিম্নরূপ–

"ভাবেন খলিফা– "আমি উটে চ'ড়ে চলেছি পরম সুখে,
কোন দোষে দোষী নওকর আজি মোর?
একই আল্লার বান্দা দু'জনে, হাসি কাঁদি সুখে দুঃখে?
ব্যাথা–বোধ আছে আমারি মতন ওর।
বেশ তবে এই মিথ্যা ছল না বাহিরে মোদের মাঝে?
ইসলামে কোন ভেদাভেদ কিছু নাই,
সম–অধিকার দিয়াছে সে সবে ধ্যানে ধারণায় কাজে,
মুসলমান– সে মুলমানের ভাই!"[১]
[রাখাল খলিফা– বুলবুলিস্তান পৃঃ ১৪৪]

অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় স্কুল পাঠ্য বইয়ের যেখানে সম্ভব সেখানেই তিনি ইসলামী কথা ও কাহিনী ভাব ও প্রেরণার আমেজ সংযোগ করে রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

গোলাম মোস্তফা শিক্ষক ছিলেন। তাই তিনি স্কুলের পাঠ্য বই রচনাতেও বিশেষ সাক্ষর রেখেছেন। এসব স্কুল পাঠ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে। তিনি শিশুদের জন্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ছড়ার মাধ্যমে শিখার জন্য রচনা করেন 'ভোরের আলো' নামক বইটি। বইটিতে তিনি ছড়া লিখেন এভাবে–

অ–"অরুণ রবি ওঠে, অরুণ রবির সাথে সাথে ভোরের আলো ফোটে।"
আ–"আযান দিল ওই, এমন সময় আমরা কেন ঘরের কোণে রই।"
ক– "করিম ভোরে কোরান পড়ে। .... ইত্যাদি।"[২]

এ ছাড়াও স্কুল পাঠ্য বই 'আলোকমালা', 'আলোক মঞ্জুরী ', নতুন আলো', ইতিকাহিনী' ইত্যাদি সিরিজ লিখে প্রশংসা লাভ করেন। "এছাড়া ও কথাশিল্পী মনোজবসুর সঙ্গে যৌথভাবে রচনা করেন 'মঞ্জু লেখা' ও 'মনি মুকুর'।"[৩]

---

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
২. গোলাম মোস্তফা, ভোরের আলো, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৫৪ইং, পৃ. ৭, ১০
৩. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

"গোলাম মোস্তফা রচিত প্রথম পাঠ্য বই 'খোকা খুকুর বই', আলোক মালা সিরিজের আগেই প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজীতেও রচনা করেন 'স্কুল বয়েজ ট্রান্সলেশন ও 'নতুন বাংলা ব্যাকরণ"।[১] তাঁর রচিত এ সকল বই তৎকালীন অধিকাংশ স্কুলেই পাঠ্য পুস্তক তালিকায় স্থান পেয়েছিল। তিনি শিক্ষক ছিলেন বলেই কিশোর –কিশোরী ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর এই সকল পাঠ্য পুস্তক সমাদৃত হবার কারণ শিশু মানস গঠনোপযোগিতামূলক রচনা। মাফরুহা চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেছেন–"কবি গোলাম মোস্তফা কেবল একজন কবিই নন। একজন সচেতন শিক্ষাবিদ এবং ব্রিটিশ আমলে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা দিয়ে। সচেতন কৃষকের মত মহৎ জীবনের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে শিশুর মনোভূমি প্রস্তুতের গুরুদায়িত্ব পালনে সযত্ন প্রয়াসী। তিনি শিশুদের জন্য কবিতা লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন শিশু পাঠ্য বই।"[২]

কবির জেষ্ঠ্যকন্যা ফিরোজা খাতুন এ সম্পর্কে বলেন–"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্ষর পরিচয় অয়ে–অজগর। আয়ে–আনারস এরপরে অক্ষর পরিচয়ে কবি গোলাম মোস্তফাই প্রথম ছবি ও ছড়ার মাধ্যমে আলোকমালা পাঠ্য পুস্তক তৈরী করেন।" [৩]

নাসির হেলাল এই সম্পর্কে লিখেছেন "তিনি ছাত্র–ছাত্রীদের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে নীতি উপদেশ ও ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াসী।"[৪]

গোলাম মোস্তফা ছোটদের জন্য পথের আলো, নূতন আলো, ইসলামী নীতিকথা (১৯৩৫), কাব্য বাহিনী (১৯৩৮), ইতিহাস পরিচয় ও মরুদুলাল (১৯৪৮) নামক গ্রন্থ সমূহ রচনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য নামে একটি পাঠ্যবই ও সংকলন করেন।" [৫]

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২. ঐতিহ্য সম্পাদক অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম, জুলাই –ডিসেম্বর'৯৭, সংখ্যা – পৃ. ১১১
৩. ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৪. ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৫. খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদক, প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল –মে– জুন'৯৮ সংখ্যা, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম খাঁ গোলাম মোস্তফার শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কে লিখেছেন –"আমরা অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম তরুণদের চিত্তে উদ্দীপ্ত প্রেরণার অন্যতম প্রতীক হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। যে কালে বাংলা সাহিত্যের আকাশে নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন কারো আবির্ভাব ঘটেনি। সেই কালে মুসলিম বাংলায় গোলাম মোস্তফাই প্রায় একমাত্র কাব্য পথচারী যার কবিতা দেশময় স্কুল কলেজের ছেলে–মেয়েরা ক্লাশে পড়তো, বাইরে আবৃত্তি করতো। মজলিস–মাহফিলে সুর সংযোগে গাইত। বাংলার সে অবসাদ ক্লিষ্ট মুসলিম সমাজের ভীরু জীবনে গোলাম মোস্তফার কবিতা ছিল ভ্রাম্যমান চারনের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের জাগরণী গান।" [১]

তিনি তরুণদের আগ্রহ– অধীর বুকে বড় হবার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাদের সামনে জীবনের লক্ষ্যকে মহোন্নত করে ধরে, তিনি তাদের কণ্ঠে মহান কুরআনের বাণী সূরা ফাতেহাকে দিয়েছেন সুরময় ছন্দে তরজমা করে ; আজও তার চিত না আত মিলাদ মাহফিলের হাজারো বৈঠকে পরম ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে আসছে। [২]

১. ইব্রাহীম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফার আদর্শ ও অন্তরঙ্গতা, সঙ্গ্রহ ও সম্পাদনা, ফিরোজা খাতুন বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা – ১৯৬৮ইং, পৃ. ৫

২. ইব্রাহীম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার অনুবাদ সাহিত্য ও ছন্দ বৈচিত্র্য

অনুবাদের ক্ষেত্রেও গোলাম মোস্তফার অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন–"মৌলিক কবিতায় লেখক চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য অনুবাদ করার সময় তাঁর আজীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। সাধারণ অনেক কবিরা নিজস্ব বিশ্বাসের কোন মূল্য দেন না। হয়তবা তাঁদের কারোরই স্থিতিশীল বিশ্বাস নেই। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা তাঁরা জানেন না। মুহূর্তের অনুভূতিকে বা উপলব্ধিকে কবিতায় রূপ দেয়াকেই তাঁরা কবির কাজ বলে মনে করেন। গোলাম মোস্তফা যে মানেরই কবি হোন, তিনি সেই প্রকৃতির কবি ছিলেন না। তিনি যে মুহূর্তের অনুভূতি তা উপলব্ধিকে রূপ দেননি, তা নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে তিনি ভাবরূপে দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু তিনি যে এক মহা জাতির অংশ এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের অন্তর্গত এ কথা তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। সে জন্য কি ধরনের কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করা তার উচিত হবে এটা তিনি পরিকল্পিতভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। এবং আরো তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলীতে সেই সুনির্বাচিত অনুবাদের উদাহরণ পাচ্ছি।"[১]

তিনি ইংরেজী, আরবী, উর্দু ইত্যাদি সাহিত্য হতে গদ্য এবং কবিতার অনুবাদ করেন। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ এই সম্পর্কে লিখেছেন– "সাহিত্য–জীবনের প্রাথমিক পর্বেই গোলাম মোস্তফা অনুবাদ করেন উইলিয়াম কাওপার (জ্ঞান লাভ, মোসলেম ভারত, ১৩২৭), টেনিসন (গুরু, সওগাত, ১৩২৬) প্রমুখ ইংরেজ কবির কবিতা।[২]

গোলাম মোস্তফা ইকবাল ও জামীর কবিতা–অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছিলেন।[৩]যেহেতু তিনি আজীবন মুসলমানের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং

১. নতুন কলম (মাসিক পত্রিকা) ঃ সম্পাদক মোশারফ হোসেন খান, আষাঢ় ১৪০৬, জুন ১৯৯৯ইং সংখ্যা, পৃ. ২০

২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৭ইং, পৃ. ৩১

৩. দ্রষ্টব্য ঃ জামী (নিবেদন, সওগাত, ১৩২৬ হালী, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৪৫), ইকবাল প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত ফার্সী ও উর্দু কবির কবিতা তিনি অনুবাদ করেন। ইকবালের কাব্যাদর্শ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানোত্তরকালে প্রাচ্যের এই কবির বহু কবিতা ও কাব্য অনুবাদ করেন মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭ইং, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আদর্শকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ দর্শন মনে করেছেন। সে জন্যই ইসলামের আদর্শে ও দর্শনে আত্মনিবেদিত এই দুজন, কবির মধ্যে তিনি যেমন তার আত্মার ক্ষুধা নিবারণের পথ খুঁজে পেয়েছেন তেমনি মুসলিম উম্মার আত্মোন্নতির পথও এই কাজে আছে বলে বাঙালী মুসলিম পাঠকের জন্য এই অনুবাদ অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছেন।[১]

গোলাম মোস্তফা ইকবালের ভক্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত 'ইকবাল ও রবীন্দ্রাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।[২] গোলাম মোস্তফা 'শিকওয়াহ' ও 'জবাব–ই–শিকওয়াহ' এর সম্পূর্ণটাই অনুবাদ করেছেন।

কিন্তু মুসাদ্দাস–ই–হালীর কোন ভূমিকা পাওয়া যায়নি।[৩] তবে ৬ (ছয়) পংক্তির স্তবকের স্বর ও ছন্দে অনুদিত শেষ স্তবকটি বলে দেয় হালীর কাব্য গ্রন্থের অনুবাদে গোলাম মোস্তফার কি স্বার্থ ছিল।২ স্তবকটি হল–

"একমাত্র খুদা তা'লাই সত্য এবং সার,

লিখিল ধরায় থাকবে তাঁহার পূর্ণ অধিকার।

তিনি ছাড়া আর যা কিছু সবই হবে লয়

কেউ রহেনি, কেউ রবে না– এ কথা নিশ্চয়।

বাদশা গোলাম এই দুনিয়ায় সবাই মুসাফির

বিদায় নিয়ে যেতে হবে–এইটে যেন স্থির।"[৪]

আল্লাহ্ই সমস্ত কিছু, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই একমাত্র সত্য–এটাই মুসলমানের বিশ্বাসের মূল। ইকবালও এর বাইরে যাননি।[৫] সেই জন্য 'খিতাব–ব– জাবিদ' [পুত্র জাবিদের প্রতি] কবিতায় ইকবালের বক্তব্যে গোলাম মোস্তফা এভাবে অনুবাদ করেছেন–

---

১. নতুন কলম (মাসিক পত্রিকা), সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, জুন ১৯৯৯ সংখ্যা, পৃ. ২০

২. গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬২ইং, পৃ. ২০৯

৩. নতুন কলম (মাসিক পত্রিকা) ঃ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, জুন–১৯৯৯ সংখ্যা, পৃ. ২০

৪. গোলাম মোস্তফার কাব্য গ্রন্থাবলীর সম্পাদক, যিনি আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে বইটি প্রকাশ করেছেন তিনিও মুসাদ্দাস–ই–হালীর কোন সুনির্দিষ্ট পরিচয় দেননি।

৫. নতুন কলম ঃ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, শাহাবুদ্দীন আহম্মদ, অনুবাদক গোলাম মোস্তফা , জুন ১৯৯৯ সংখ্যা, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার মা তোমাকে প্রথম যে সবক দিয়েছেন
ভোরের বাতাসের মত তাতেই ফুটে উঠেছে
তোমার জীবনের ফুল কুঁড়ি
তার স্নিগ্ধ স্পর্শেই এ তুমি পেয়েছ
এই রূপ আর এই খুশবু।
হে আমাদের ভবিষ্যতের আশা–ভরসা,
এতেই ত তোমার কিমৎ!
স্থায়ী সম্পদ, সেখান থেকেই তুমি লাভ করেছ।
তারি ঠোঁট থেকে শিখেছ "লা–ইলাহা–ইল্লাল্লাহু" কলেমা
হে পুত্রএবার এর দর্শন তত্ত্ব
আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
লা–ইলাহার যে কী প্রভাব তা তোমায় বলছি শোন;
যদি লা–ইলাহা বল ত অন্তর থেকেই বল,
তা হলে তোমার ভিতর থেকে বের হবে তোমার আত্মার খুশবু।
চন্দ্র সূর্য লা–ইলাহার বেদনাতেই ঘুরে মরছে–
পাহাড় প্রান্তরও প্রকাশ পাচ্ছে সেই একই বেদনার মত'
লা–ইলাহা কথাটি শুধু মুখে বলবার জন্য নয়,
কথাটি যেন ঠিক একখানা নাঙ্গা তলোয়ার।
এর আঘাতে খেয়েও যে বেঁচে থাকে, তার অদ্ভূত জীবন।
এ একটা অব্যর্থ কার্যকরী মারণ যন্ত্র।"[১]

এই কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শাহাবুদ্দীন আহম্মদ বলেন,– "যেহেতু আমি উর্দু ভাষায় পারদর্শী নই অতএব মূলের সৌন্দর্য এখানে কতটা এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ অনুবাদ থেকে বোঝা গেলো যে, গোলাম মোস্তফা চেষ্টা করলে সুন্দর আধুনিক গদ্য কবিতা লিখতে পারতেন। পরবর্তীকালে মনির উদ্দীন ইউসুফ ফেরদৌসীর 'শাহনামা" এই গদ্য কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন। আমি যেন

১. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা ঃ কাব্য গ্রন্থাবলী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭২ইং, পৃ. ৫৮০

Dhaka University Institutional Repository

মনির উদ্দীন ইউসুফের কোন লেখায় পড়েছিলাম যে, সৈয়দ আলী আহসানের অনুরেধে তিনি গদ্যে "শাহনামা" অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য এ দেশে অন্য কোন দেশের ভাষায় পদ্যছন্দে লেখা কবিতা গদ্য ছন্দে অনুবাদ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলির অনুবাদ ও Prose Verse বা গদ্যে করা হয় কিন্তু গোলাম মোস্তফা "খিতাব-ব-জাবিদ" ছাড়া "শিকওয়াহ"ও "জবাব-ই-শিকওয়াহ" সমেত ইকবালের যে ২০টি কবিতার অনুবাদ করেছেন তার সবগুলোই পদ্য ছন্দে করেছেন।"[১]

গোলাম মোস্তফার "শিকওয়াহ" ও "জবাব-ই-শিকওয়াহ" অনুবাদ অন্য কারও "শিকওয়াহ" ও "জবাব-ই-শিওয়াহ"থেকে মোটেই দুর্বল নয়। অস্বচ্ছ নয় এবং অস্বতঃস্ফূর্তও নয়, গোলাম মোস্তফার সমস্ত কাব্যগ্রন্থই বলে দেয় তাঁর আর যে দূর্বলতাই থাকুক, মৌলিকতায় ও কবিত্ব শক্তিতে তাঁর আকৃতি দৈত্যতুল্য না হোক, তাঁর ছন্দ-নির্মাণ ক্ষমতা ছিল। বলিষ্ঠতায় হয়ত তা সতেন্দ্রনাথের মত নয়, তা মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলামের মত নয় কিন্তু করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।[২] "হুদী" কবিতার একটি স্তবক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, সাামন্য শক্তি নিয়ে এই অনুবাদ অসম্ভব। তিনি অনুবাদ করেছেন এভাবে-

"ওরে পথিক উট আমার -
তাতার হরিণ ক্ষিপ্রতার;
তুই দিরহাম তুই দিনার -
কম-বেশি হয় হোক না তার
জীবন্ত দান তুই খুদার -
জোর কদমে চলরে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥"[৩]

১. নতুন কলম (মাসিক পত্রিকা) ঃ সম্পাদক মোশারলফ হোসেন, শাহাবুদ্দীন আহম্মদ ঃ অনুবাদ গোলাম মোস্তফা, জুন ১৯৯৯ সংখ্যা, পৃ. ২১

২. নতুন কলম (মাসিক পত্রিকা) ঃ সম্পাদক মোশারলফ হোসেন, শাহাবুদ্দীন আহম্মদ ঃ অনুবাদ গোলাম মোস্তফা, জুন ১৯৯৯ সংখ্যা, পৃ. ২৩

৩. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা ঃ কাব্য গ্রন্থাবলী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭২ইং, পৃ. ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতাটিতে অন্তঃমিল রয়েছে। "শিকওয়াহ" ও "জবাব-ই-শিকওয়াহ"র অনুবাদ অবশ্য চিরাচরিত বাংলা কবিতার স্বরবৃত্তে [শিকওয়াহ স্বরবৃত্তে রচিত] মাত্রাবৃত্ত [জবাব-ই-শিকওয়াহ মাত্রাবৃত্তে রচিত] ছন্দে রচিত। সেই জন্য এখানে অসাধারণত্ব বা মৌলিকত্ব আবিষ্কার করতে যাওয়া অপপ্রয়াস। কিন্তু "হুদী" কবিতাটি স্বরবৃত্তে রচিত হলেও এর ভঙ্গীটা অভিনব।[১]

গোলাম মোস্তফার নিকট ইকবালের ন্যায় হালীও প্রিয় ছিলেন আর তাই তিনি হালীর "মুসাদ্দাস " অনুবাদে আগ্রহী হন। তিনি হালীর কবিতার অনুবাদ করেছেন এভাবে-

বিজ্ঞ হাকিম বোক্‌রাতেরে শুধাল একজনঃ
"মরণ-ব্যাধি তোমার মতে বল ত সে কোন?"
বল্‌লে ঃ 'এমন কোন ব্যাধিই দেখিতে নাহি পাই-
ওষুধ যাহা খুদাতা'লা পয়দা করেন নাই।
শুধুই কেবল এক বিমারের ওষুধ নাহি আর-
হাকিমকে যে মানে না আর লয়না বিধান- তার।"
"বুঝাও যদি তার সে রোগের কারণ ও লক্ষণ,
হাজার রকম ভুল দেখাবে অম্‌নি সে তখন।
মান্‌বে না সে কোনই দাওয়া, কোনই যোগাযোগ,
এম্‌নি করেই দিনে দিনে বাড়াবে তার রোগ।
হাকিমকে সে এতেই বিকট দেখবে চোখে তার-
জীবন-প্রদীপ ঘিরবে মরণ-আঁধিয়ার।"
এমনি দশাই এই দুনিয়ায় মোদের কওমের,
জাহাজ তাহার ঘূর্ণীজলে ডুবছে সমুদ্রের।
কিনারা সে অনেক দূরে, তুফান ভারী তায়।'
হর্‌দম্ এই ভয় পাছে হায় জাহাজ ডুবে যায়।
আজব! তবু আরোহীরা ফিরছে না ক' পাশ,
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে,- পড়ছে না নিশ্বাস।"[১]

১. মোশাররফ হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা ঃ কাব্যগ্রন্থাবলী, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭২ইং, পৃ. ৫০৬

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি ইংরেজী, উর্দু, আরবী, ফারসি সাহিত্য হতে অজস্র কবিতা অনুবাদ করেছেন। ফারসী সাহিত্যের প্রেমিক কবি জামীর একটি কবিতার অনুবাদ 'নিবেদন' নামে প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের 'সওগাতে।[১] ১৯২৭ সালের মাসিক 'সাহিত্যিক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তার এখওয়ানুস সাফার' অনুবাদ।[২] বিখ্যাত সাহিত্য কর্ম "এখ ওয়ানুস সাফা"–র অনুবাদ করে তিনি এর নাম দেন 'জয়–পরাজয়'।

আল কোরআনের অনুবাদ সাহিত্যে গোলাম মোস্তফার স্মরণীয় অবদান।[৩] তিনি কুরআন মজীদ পাঠ ও তরজমা উপলক্ষে আরবী ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কারণ তিনি আজীবন ইসলামী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আর এ জন্যই তিনি ইসলামী বিষয়াবলীতে গবেষণায় মনোযোগী হয়েছিলেন। তবে সম্পূর্ণ কোরআন তিনি তরজমা করতে পারেনি। কবি গোলাম মোস্তফাকৃত বাংলা ও কাব্যানুবাদ মহাগ্রন্থ "আল–কুরআন" থেকে–

"সকল তারীফ সেই আল্লাহ তালার (১)
লিখিলের রব যিনি পরোয়ারদিগার। (২)
যিনি চির–প্রেমময় চির– মেহেরবান
বিচার–দিনের যিনি মালিক মহান। (৩)
তোমারেই শুধু মোরা করি ইবাদত
তোমারি কাছেতে চাই শকতি– মদদ (৪)
দেখাও সরল পথ (৫) তাদের সে পথ
যাদের উপরে ঝরে তব নিয়ামত
নয় তাহাদের পথ অভিশপ্ত যারা (৬)
কিংবা যারা পথ পেয়ে হল পথহারা (৭) ....."[৪]

১. ডঃ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২. ডঃ মাসুকে রাসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৪. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদিত), প্রেক্ষণ, কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণ সংখ্যা, এপ্রিল –মে–জুন ১৯৯৮ইং, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইকবালের 'শিকওয়া 'জওয়াব-ই-শিকওয়া'র গোলাম মোস্তফা উঁচু মানের অনুবাদ করেছেন। যেমন-

''ক্ষতিই কেন সইব বল?
লাভের আশা রাখব না?
অতীত নিয়ে থাকব ব'সে- ভবিষ্যৎ কি ভাব না?
চুপটি করে বোবার মতন শুনব কি গান বুলবুলির?
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব নীরব নম্রশির?
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী সেই সাহসেই আজকে ভাই
খোদার নামে করব নালিশ! মুখে আমার পড়ুক ছাই।''[১] [শিকওয়া]

২। "দিল থেকে যদি আসে কোন বাণী প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়
পাখনা না থাক, তবুও তাহার ঊর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশতে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা- নীল আকাশের গান সে গায়,
প্রেম ছিল মোর বেয়ারা ভীষণ, কোঁদল-পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার।"[২]

[জবাব-ই-শিওয়া]

গোলাম মোস্তফা কবি ইকবালের কাব্যাদর্শ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন।[৩] ইকবালের সেই জীবনময়ী আহবান তিনি অনুসরণ করতেন-

"খুদী কো কর বুলান্দ এতনা
কে হর তকদীর ছে পহলে-

১. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), গোলাম মোস্তফা ঃ কাব্য গ্রন্থ (প্রথম খন্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা ১৯৭২ইং, পৃ. ৪৭৭
২. আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১
৩. ডঃ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

খোদা বান্দা সে খোদ পুছে

বাতা তেরা রেজা ক্যায়া হ্যায়।"

"জ্বাল, জ্বাল, জ্বালরে আত্মশক্তি শিখা

যেত ভাগ্য বিতরণের আগে–

স্বয়ং বিধাতা কহে অনুরাগে

বলোতো বান্দা, বল কিবা চাও

আপন ভাগ্য লিখা।"[১]

ইকবালের সেই স্বপ্ন, গোলাম মোস্তফার সেই সাধনা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল হোক।[২] আল্লামা ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন–

"চীন হামারা আরব হামারা

হিন্দুস্তা হামারা।

মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতান হ্যায়

সারে জাঁহা হামারা।"[৩]

ড. খালেদ মাসুকে রসুল এই সম্পর্কে লিখেছেন– "কবি গোলাম মোস্তফা বিশ্ব মুসলিমের এক জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আজীবন সে জাতীয়তার গানই গেয়েছেন। বর্ণ–ভাষা–দেশ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে নিয়ে যে একটি মাত্র জাতি, সেই জতির অন্তর্ভূক্ত ভেবে তিনি গৌরব অনুভব করতেন। তার কাছে প্রাচ্য পাশ্চাত্য বলে কোন কথা ছিল না। সমগ্র দুনিয়াকেই তিনি নিজের দেশ মনে করতেন। বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই আলিঙ্গণের বাহু তার প্রসারিত ছিল।"[৪]

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদিত), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল–মে–জুন–১৯৯৮, পৃ. ৩৪

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৩. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৪. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা অনুবাদকে Second Creation করতে চেয়েছেন। মূল কবিতা পাঠ করে তার মনে যে ভাব জাগ্রত হয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ফলে তার অনুবাদে মূলের স্পর্শ আছে, আন্তরিকতার ছাপ আছে, মোটামুটি একটা পরিচিত পরিবেশও সৃষ্টি করতে পেরেছেন।[১]

কালাম –ই–ইকবালের " অনুবাদকের আরয' অংশে তিনি অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন–"বাংলা ভাষায় ইকবাল কাব্যের অনুবাদের প্রয়োজন আছে। আমাদের তামুদ্দুনিক সংগঠনের পক্ষে তাঁর চিন্তা ধ্যান – ধারণা, আদর্শ ও পয়গামের খুবই প্রয়োজন। কাব্যে যত রূপ রস ও আনন্দই থাকুক, তার অন্তরে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে না। প্রত্যেক জাতির কাব্য তার ঐতিহ্য আশা ও আকাঙ্খার রূপ দেয়। সেই হিসেবে ইকবাল সত্যই পাকিস্তানের জাতীয় কবি। তাঁর চিন্তা ও ধ্যানের আর্শিতে জাতির মানসলোক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কাজেই আত্মদর্শন করিতে হইলে তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।"[২] গোলাম মোস্তফা লিখেছেন –

"হিন্দু, বৌদ্ধ, চীন, জাপান
ইহুদী, নাসারা সকলেই প্রাণ,
ইসলাম দিল যে নব শিক্ষা
সবাই তাহাতে লইল দীক্ষা,
সবারই কণ্ঠে তৌহিদ বাণী,
সবারি বীণায় নূতন তান।"[৩]

''প্রবাসী'' পত্রিকার চৈত্র ১৩২৮ সংখ্যায় নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ "আরবী ছন্দের কবিতা'' ('নির্ঝর'–১৯৩৮) প্রকাশিত হয়। গোলাম মোস্তফা নজরুলের ঐ প্রবন্ধেরই প্রতিবাদি। সম্পূরক প্রবন্ধ লেখেন 'আরবী' ছন্দের বাংলা তর্জমা' নামে প্রবাসী'র বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গোলাম মোস্তফা লিখেছেন –

---

১. সাইদ –উর– রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪২

২. গোলাম মোস্তফা অনূদিত কালাম–ই–ইকবালের 'অনুবাদকের আরয' দ্রষ্টব্য।

৩. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, গোলাম মোস্তফা, কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), আহমদিয়া পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১২০–১২১

Dhaka University Institutional Repository

" গত ১৩২৮ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'প্রবাসী' তে বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম ১৮টি আরবী ছন্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবী ছন্দের সমষ্টি ১৮ নহে -১৯। তাছাড়া তিনি এক একটি ছন্দের নাম দিয়া তাহার মাত্র একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতই মনে হয় ছন্দগুলি এককভাবে সম্পূর্ণ, অর্থাৎ উহাদের কোন শাখা প্রশাখা নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহার নহে। কয়েকটি ছন্দ ছাড়া আর সবগুলির বহু শাখা-প্রশাখা আছে, আর সেইগুলির পরস্পর এত স্বতন্ত্র যে, প্রত্যেকটিকে এক একটি মূল বলিলেও ভুল হয় না। বস্তুত অধিকাংশ স্থলেই আরবী ছন্দের নামকরণ এক -একটি গ্রুপ বা বিভাগেরই নামকরণ। এই ক্ষেত্রে কোন একটি বিশিষ্ট ছন্দের পরিচয় দিতে হইলে তদন্তর্গত ছন্দ সমষ্টির যে একটি ইচ্ছামত উল্লেখ করিলেই চলিবে না, সবগুলিরই উল্লেখ করিতে হইবে। কেননা ঠিক ততখানিই সত্য। বলা বাহুল্য, এই কারণেই যতখানি সত্য অপরটি সম্বন্ধেও আমি আরবী ছন্দের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিলাম। পাঠক দেখিবেন, কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের অনূদিত ১৮টি ছন্দ ছাড়া যেগুলি অবশিষ্ট আছে। সেগুলি সংখ্যায় কত বেশি এবং কত বিচিত্র, নূতন ও মধুর। এতদ্ব্যতীত কাজী সাহেব কয়েক স্থানে আরবী ছন্দ সূত্রের উচ্চারণ ঠিকমতো ধরিতে পারেন নাই। কাজেই সেই- সেই স্থানে তাঁহার অনুবাদ ভুল হইয়াছে। তাহা ছাড়া এমন দুই একটি ছন্দসূত্র লিখিয়াছেন- যাহা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। জানি সেইগুলি তিনি কোথায় পাইয়াছেন। যথাস্থানে পাঠক উহার উল্লেখ পাইবেন।"[১]

এই প্রবন্ধের জের টেনে 'প্রবাসীর' ভাদ্র ১৩৩১ সংখ্যায় লেখেন 'নূতন ছন্দ' নামে আরেকটি প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি নূতন ছন্দের নমুনা প্রদর্শন করেন। তার একটি মানুষের নাম নিয়ে।[২]এছাড়াও তিনি আরবী

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'কবি গোলাম মোস্তফা', ঐতিহ্য (পত্রিকা), সম্পাদক অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭, ১২ বর্ষ ৭-১২ সংখ্যা, পৃ. ৪২-৪৩

২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মোতাকারির ছন্দকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করেছিলেন।উদাহরণ স্বরূপবলা যায়–

" প্রিয়ার মোর চক্ষের সচঞ্চল দৃষ্টি
রিনিরঝিন কঙ্কন কী সুন্দর মিষ্টি।"[১]

তিনি নিরাশায় কবিতাটি আরবী ছন্দে লিখেছেন। কবিতাটি হল –

"তরুণ জীবনের সকল আশা সাধ
হইল যদি সই নীরব অবসান,
নিভূক তবে দীপ
আঁধার ঘিরে নিক
থামুক পরাণের যতেক হাসি গান।"[২]

কবিতাটিতে আরবী ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কাঠামোর সাথে মিল করেছেন। অপর একটি আরবী ছন্দের কবিতায় আছে –

"ভোরের বাও বও যবে, প্রিয়ার দ্বার পাশ দিয়ে,
এস তার আধ ফোটা কুসুম –গার বাস নিয়ে।
চারুকেশ পাশে ছাওয়া তার মুখখানি,
চিরপুত প্রেম সুধায় ভরপুর বুকখানি,
যেন শ্যাম পত্রছায়া শোভা পায় লাল গোলাপ,
মুখে ধীর স্নিগ্ধ হাস বুকে লাজ রক্ত ছাপ।"[৩]

ছন্দের উপর কবি আরও বহু রকম পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি বাংলা স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কোথাও হাতল ভাঙ্গিয়া, পা ভাঙ্গিয়া আবার কোথাও বা অনেকগুলি পা লাগাইয়া, পা ভাঙ্গিয়া আবার কোথায়ও অনেকগুলি পা লাগাইয়া নানা রকম ধ্বনি তরঙ্গ তুলিয়াছেন।[৪] যেমন – তাঁর রচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা–

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণ সংখ্যা, এপ্রিল–মে–জুন ১৯৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৩৯
২. আব্দুল কাদির (সম্পাদক),প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৪. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

"ঝড়ে রাতি অন্ধকার
তুফান মাঝে ডুবছে তরী
নাই মাঝি নাই কুল-কিনার।
মরণ ভয়
সব হিয়ার
উঠেছে রব –
'হায়রে রে হায় ।'
হঠাৎ যে ঘোর প্রলয় রাতে –
কে তুমি নূর মুর্তিমান
ধরলে এসে হাল সে তরীর
করলে মুস্কিল আসান! "

অপর একটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা –

"আমি রচিব তোমার যেই সব মূরতি
হবে চির – সুন্দর সে যে চির যুবতী।
তার রূপ–যৌবন
নাহি শুখাবে কখন,
নাহি দেশ কাল পাত্রের বাধা বন্ধন,
হবে পরীর মতন তার সহজগতি। "

কবির অপর একটি কবিতায় আছে –

"কার সে হেলাতে
এই অ–বেলাতে
বউ–ঝি চলিল অন্য জেলাতে!
সব গা ঘামারে !
পালকি থামারে
বৃক্ষ ছায়াতে একটু নামারে !
শুনল না ত'রে
কান্না–কাতরে
প্রাণ কি সবারি তৈরী পাথরে! "[১]

জসীম উদ্দীন গোলাম মোস্তফার কবিতার এই ছন্দের সুচারু মিল সম্পর্কে লিখেছেন – " তাঁহার সুক্ষ্ম শিল্প চাতুর্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

১. গোলাম মোস্তফা, 'ওড়ে বেহারা' কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার কবিতায় মিলের চাতুর্য। কথার সঙ্গে যেন স্বেচ্ছায় আসিয়া মিল বন্ধন পড়িয়াছে। কতগুলি মিল বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আরবী ফারসি সর্বনাম শব্দের সঙ্গে বাঙলা শব্দের মিল যথা ' কোরবাণী 'কবিতায় ইব্রাহিম প্রাণ প্রতিম, রহমানের রহীম, প্রেম অসীম। 'ভবিষ্যতের স্বপ্ন' কবিতায় কন্যা কুমারিকা, নবশিখা, রাজটীকা, কুহেলিকা। শব্দের পর শব্দ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পাখির মত উড়িয়া আসিয়াছে। নিম্নের পঙ্‌তি দুইটির মিল আরও অপূর্ব,

"বয়স তাহার বছর বারো তেরো
কিম্বা কিছু বেশী হবে এরো।"

অথবা –

"এতেই মোদের অনেক দিনের চেনা,
কেউ যদি কক্‌খনো জানে না।"[১]

জসীম উদ্দীন আরও লিখেছেন–'স্যার ওয়ালটার স্কট তাহার কবিতায় সর্বনাম শব্দের চমৎকার ধ্বণি তরঙ্গ তুলিতে পারিতেন। মাইকেল এবং সতেন্দ্র নাথের কোন কোন কবিতায় এরূপ সর্বনাম শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার কবিতায় বহু আরবী–ফারসি সর্বনাম শব্দ ব্যবহার করিয়া যে সুন্দর ধ্বনি–তরঙ্গ তুলিয়াছেন তাহার জন্য কবিকে বিশেষ স্বীকৃতি দিতেই হইবে।"[২] যেমন –

"গাজী আনোয়ার জগলু জামাল
রেজা খাঁ, আমীর সৌদ্ কামাল
সকলেই যেন মিলেছে আসিয়া
সফল করিতে এই বিজয়।"[৩]

---

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪
২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪
৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের কবিতাটিতে ইংরেজী সর্বনাম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেমন,

"ভাসে রণতরী জেপেলীন
গর্জে কামান বোমা ও মাইন
যন্ত্রগর্ভে ধরে না গর্ব
খুনিয়ারা সারা দুনিয়াটার।
যাত্রীর সাথে যন্ত্রহীনের
তুমুল যুদ্ধ চমৎকার।"[১]

জসীম উদ্দীন কবির অপূর্ব ছন্দে কবিতা রচনা সম্পর্কে লিখেছেন– "আধুনিক যুগে তথাকথিত কবিরা ছন্দের অপূর্ব সংগ্রাম খচিত সুরলোক হইতে কবিতাকে গদ্যের আঁকশি দিয়া মাটিতে টানিয়া আনিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের কাছে কবি গোলাম মোস্তফার নানা ছন্দে রচিত করিতার মূল্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যখন তাঁহার ছন্দ চাতুর্য অবলোকন করি তখন বিস্মিত না হইয়া পারি না। আধুনিক বাঙালী মুসলমানের কাব্য গগণে নজরুল ইসলাম ও কবি গোলাম মোস্তফার উদয় ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় ইহারা দুই জনই সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। তাই ইহাদের হাতে পড়িয়া বাঙলা কাব্য সুন্দরী শুধুমাত্র দেশী অলংকারেই ভূষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আরবী ফারসী কবিতায় বহু ছন্দ অঙ্গে পরিয়া আপন রূপ প্রভা আরও বিস্তার করিতে পারিয়াছে। মুন্সীগঞ্জ বাঙলা সাহিত্য অধিবেশনে কবি গোলাম মোস্তফা নানারকম আরবী ছন্দকে বাংলা কবিতায় রূপান্তরিত করিয়া যে অপূর্ব প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা শ্রবণ করিয়া তখন বহু প্রবীণ সাহিত্যিক কবিকে মুহুর্মুহু প্রশংসাবাদ প্রদান করেন। এ বিষয়ে কবি একদিন বলিয়াছেন, "I carried house with me." [২]

১.খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফা ও তাঁর গান

গোলাম মোস্তফা একাধারে কবি, গায়ক, গীতিকার ছিলেন। ছেলেবেলাতেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। ছাত্র জীবনে তারই চেষ্টায় তৎকালীন মুসলিম বাংলার অনলবর্ষীয় বক্তা মরহুম ইসমাঈল হোসেন সিরাজী শৈলকুপায় গমন করেছিলেন। সেই বিশাল জনসভায় গোলাম মোস্তফা স্বরচিত গান গেয়ে সিরাজীর বক্তৃতার উদ্বোধন করেন। তিনি সেই বয়সেই কিশোর কবি গীতিকার ও গায়ক হিসেবে সিরাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[১]

তিনি বহু স্মরণীয় সঙ্গীতের গীতিকার। এ ছাড়া তিনি ব্যক্তি মনের আবেগ, অনুভূতি, প্রেম ও প্রকৃতি এবং জাতীয় জাগরণ ও ইসলামী আদর্শ–ঐতিহ্য অবলম্বন করে বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। বিভাগ–পূর্বকালেই প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ এবং সমকালীন আরও অনেক শিল্পীর কণ্ঠে গোলাম মোস্তফা রচিত সঙ্গীত গীত হয়। রেকর্ডেও ধারণ করা হয়। কোন কোন রেকর্ডে গোলাম মোস্তফা স্বয়ং কোরাসে কণ্ঠও দান করেন। তার রচিত ইসলামী গান, হামদ, নাত ইত্যাদি এবং 'পাকিস্তানের গান' সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করে।[২] গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দীন, ওস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁর একজন দীনভুক্ত সাগরেদ ছিলেন। এই তিনজনই তাঁর নিকট গান শিখেছেন।[৩]

কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গীত গ্রন্থ "তারানা–ই–পাকিস্তান" এবং 'গীতি সঞ্চয়ন'। 'তারানা–ই–পাকিস্তান' গ্রন্থে 'ইসলামী গজল' শিরোনামে ১৭টি গান, 'পাকিস্তানী গান' শিরোনামে ১৫টি গান এবং 'বিবিধ গান' শিরোনামে ৩০টি গান সংকলিত হয়েছে। "তারানা–ই–পাকিস্তান" গ্রন্থটি সুর শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

---

১. ড. খালেক মাসুকে রসুল; মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং, পৃ. ৬১

২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৭ইং পৃ. ৩৪

৩. 'উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ', 'নজরুল–রচনাবলী' (চতুর্থ খন্ড) ঃ আব্দুল কাদির সম্পাদিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন–

" আব্বাস –

তোমার কণ্ঠেই আমার পাকিস্তানের গান

নিশি দিন ঝংকৃত হয়ে ফিরেছে।

তারানা–ই–পাকিস্তান তাই তোমারি হাতে তুলে দিলাম।"[১]

কারণ তাঁর অনেকগুলো গান আব্বাস উদ্দীন রেকর্ড করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি নিজের কণ্ঠেও যেন গানগুলি রেকর্ড করেছিলেন, সে গুলির প্রথম লাইন উদ্ধৃত হল–

১. "বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার----------"

২. "নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি----------"

৩. "হে খোদা দয়াময় রহমানুর রাহিম----------"

৪. "আমার মুহাম্মদ রসুল----------"

গোলাম মোস্তফা এবং আব্বাস উদ্দীন একবার 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি হেমচন্দ্র সোম মহাশয়ের সাথে কিছু গান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সোম বাবু অতিশয় আন্তরিকতার সাথে প্রস্তাবে রাজি হন। তবে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার অর্থাৎ বড় সাহেবের সম্মতি গ্রহণ করতে তাদের উপদেশ দেন। অতঃপর গোলাম মোস্তফা বড় সাহেবকে বুঝালেন যে, ইসলামী সঙ্গীতের ন্যায় পাকিস্তানী গানেরও বহুল বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে। সাহেব অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন– Have you composed the song? তিনি তখন 'পাকিস্তান সে পাকিস্তান' এবং ঝিরঝির ঝির পূবাল বাতাসে ধাও"এই দুটি গান পড়লেন এবং সাথে সাথে ইংরেজী অনুবাদ করলেন। বড় সাহেব গান দুটি approve করলেন। গোলাম মোস্তফা এই সম্পর্কে লিখেছেন "কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯৪৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু–মুসলমানের Riot লাগিয়া গেল। ফলে গান কেরর্ড করা হইল না। হিন্দু শিল্পীরা কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন এবং ভয় দেখাইতে লাগিলেন, দেখিব গোলাম মোস্তফা আব্বাস উদ্দীন কেমন করিয়া পাকিস্তানের গান রেকর্ড করে।"[২]

---

১. গোলাম মোস্তফার তারানা–ই–পাকিস্তান গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র দ্রষ্টব্য।

২. গোলাম মোস্তফা, গীতি সঞ্চয়ন ফিরোজা খাতুন, সম্পাদিত, পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর সোম বাবুর উৎসাহে একটি বৃটিশ হোটেলের (ফারপোর) 'Orchestra Party' নামক একটি 'British Band Party–এর সাথে গোলাম মোস্তফা ও আববাস উদ্দীনের পরিচয় করে দিলেন। তাঁরা গানটি গাইলেন এবং 'British Band Party'-র তারা ইংরেজী Notation তুলে নেন। অতঃপর কলকাতার চৌরঙ্গী হতে তিনটি মোটর বোঝাই Band Party র সহিত গান রেকর্ড করার জন্য তাঁরা দমদমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে গান রেকর্ড হল।[১]

এই সম্পর্কে বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন "বেলা দুটোর সময়ে দমদম পৌছুলাম। কারখানা বন্ধ। কারখানার পিছন দরজা দিয়ে স্টুডিওতে ঢুকলাম। চারখানা গান রেকর্ড করলাম আমি কবি গোলাম মোস্তফা, বেদার উদ্দীন, কাদের জমিরী এবং ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার মিলে। স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেল। বাসায় ফিরবার পথে মনে হচ্ছিলো প্রাণ যদি এখন যায়ও মৃত্যুর পূর্বক্ষণে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো এই ভেবে যে, এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পকিস্তানের প্রথম প্রশস্তি গাইবার সৌভাগ্য তো অর্জন করে গেলাম।[২]

সোমবাবুর কল্যাণে ১৪ই আগস্টের দুই–একদিন পূর্বেই পাকিস্তানের রেকর্ড বাজারে বের হয়েছিল। সিনেমায়, রেঁস্তোরায়, চায়ের দোকানে সর্বত্রই পাকিস্তানের সঙ্গীত সত্যিই এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছিল।[৩] অতঃপর গোলাম মোস্তফা রচিত নিম্নলিখিত গানগুলিই তখন রেকর্ড করা হয়। গানগুলি হল–

১। "আল্লা আল্লা বলোরে ভাই যত মোমিনগণ
পাকিস্তানের বয়ান করি শোনো দিয়া মন------"

২। "ওরে ও মোমিন ভাই, তুই করিস কেন ভয়
পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে হবে হবে
জয়----------"

৩। "চল্ চল্‌রে মুকুল দল-------"

৪। "উড়াও উড়াও আজ কওমী নিশান--------"

৫। "পাকিস্তানের গুলিস্তানে আমরা বুলবুলি--------"

৬। "পাকিস্তানের কওমী ফৌজ আমরা পাহারাদার চোরা
বাজারের শয়তান যত হুঁশিয়ার---"

১. ফিরোজা খাতুন, (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২. আব্দুস সাত্তার (সম্পাদিত) (ছোটদের জীবনী গ্রন্থ (২২), বন্দে আলী মিয়া কবি গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবিলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৮৬ পৃ. ৩০

৩. আব্দুস সাত্তার (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

এই গানগুলির সুর দিয়েছিলেন সুর-শিল্পী গিরীন চক্রবর্তী।[১] এছাড়া ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়দে আযম ঢাকায় এসেছিলেন। রেসকোর্সের ময়দানে বিপুল জনতার সম্মুখে তিনি বক্তৃতা দান করলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনেও পাকিস্তানের গান কোরাসে গীত হল। আব্বাস উদ্দীন গোলাম মোস্তফা এবং অপর দু'তিনজন শিল্পী তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"[২]

১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে কবি গোলাম মোস্তফা গান গেয়েছিলেন। এই সম্পর্কে আব্দুস সাত্তার তাঁর "ফেলে আসা দিনগুলো" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন "সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন কবি গোলাম মোস্তফা সুললিত কণ্ঠে গেয়ে এবং নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে। চট্টগ্রামের স্থানীয় শ্রোতা দর্শকরা যারা কোনদিন গোলাম মোস্তফা কিংবা সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দীনকে দেখেননি তারা কানাকানি শুরু করলেন, 'উনিই কি গায়ক আব্বাস উদ্দীন? গোলাম মোস্তফা সাহেব তো কবিতা লেখেন, তিনিতো কবি, গায়ক হলেন কবে থেকে। বিরাট জনসমুদ্রের কোলাহলে এইসব শ্রোতা দর্শক মাইকের ঘোষণা ঠিকমত শুনতে পারেননি। কাজেই তাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল, গান যখন সুললিত কণ্ঠে গাইছেন তখন নিশ্চয়ই আব্বাস উদ্দীন হবেন।"[৩]

কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী গান লেখার বহু আগে থেকেই গোলাম মোস্তফা ইসলামী গান লিখতেন, সুর দিতেন, গাইতেন এবং যেসব স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন তার ছাত্রদের তিনি সেই গান শেখাতেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গাওয়াতেন।[৪] তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ গানটি না'ত-যা কিংবদন্তীর মর্যাদা অর্জন করেছে। মিলাদ-শরীফে গীত এই গানটির রচিয়তা যে গোলাম মোস্তফা তাও হয়ত অনেকে অবগত নয়। এই গানটি আজও বাংলার ঘরে ঘরে মিলাদ শরীফে গীত হয়। গানটি হল-

"ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ আলাইকা ॥

---

১. আব্দুস সাত্তার (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২. আব্দুস সাত্তার (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩. আব্দুস সাত্তার, সুরভি অন্যতর, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬ইং, পৃ. ৫১
৪. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল-মে-জুন '৯৮ সংখ্যা পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানেরর ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি॥
চাঁদ, সুরুজ আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে॥
তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এলো ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে ॥
নবী না হয়ে দুনিয়ার
না হয়ে ফেরেশতা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজার বার॥"[১]

তাঁর সুরা ফাতিহার কাব্যানুবাদ আজও বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ।সুর সহযোগে এই অনুবাদ মোনাজাতের সময় নিবেদন করতেন কবি নিজে ও মরহুম আব্বাস উদ্দীন আহমদ।[২] অনুবাদটি হল–

"অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী।
যতে গুণ গান, হে চির মহান,
তোমারি অন্তর্যামি॥
দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি কাছে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণা কামি॥
সরল সঠিক পূণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি'

১. গোলাম মোস্তফা, তারানা–ই–পাকিস্তান, কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), আব্দুল কাদির সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১ইং, পৃ. ২৭৯

২. খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদক) প্রাগুক্ত পৃ ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

চালাও সে পথে যে পথে তোমার
প্রিয় জন গেছে চলি।
যে পথে তোমার চির অভিশাপ
যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ
হে মহাচালক মোদের কখনো
ক'রো না সে পথ–গামী॥" [১]

স্বদেশ, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্যের গৌরব কীর্তণসহও গোলাম মোস্তফা গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ভাষার গানটি হল–

''মোদের সোনার বাংলা ভাষা
সকল ভাষার চাইতে খাসা
প্রাণের চেয়ে প্রিয় সেযে,
সবার চেয়ে ভালবাসা।'' [২]

তাঁর দেশাত্মবোধক গানটি হল –

" সকল দেশের চাইতে সেরা মোদের বাংলাদেশ।
সুজলা–সুফলা শস্য–শ্যামলা স্নিগ্ধ শীতলা বেশ।"[৩]

ড. খালেদ মাসুকে রসুল এই সম্পর্কে লিখেছেন–"তিনি নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বজাতীয় ঐতিহ্যের, নিজের মাতৃভাষার গৌরবোজ্জ্বল দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর সঙ্গীতে বাংলার মুসলমান নিজের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তি লাভ করে, পুলকিত রোমাঞ্চিত হয়। জাতীয় জীবনের যে কোন স্মরণীয় ঘটনা তাঁর সঙ্গীতে অমরত্ব লাভ করেছে।''[৪]

চল্লিশের গোড়ার দিকে মোহামেডান স্পোর্টিং এর ঐতিহাসিক বিজয় উপলক্ষে কবি গোলাম মোস্তফা সঙ্গীত রচনা করে জাতিকে উৎসাহিত করেছিলেন। এই সময় তিনি সুদীর্ঘ ও সুন্দর কবিতাও রচনা করেছিলে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই সম্পর্কে লিখেছেন– "বাঙলার মুসলিম জাতীয় জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিং এর বিজয় বার্তা যে প্রভূত পরিমাণে

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭১
২. গোলাম মোস্তফা, গীতি সঞ্চয়ন, ফিরোজা খাতুন (সম্পাদনা), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা–১৯৬৮ইং, পৃ. ২৭
৩. গোলাম মোস্তফা , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।.....কবি গোলাম মোস্তফা সে সময়ে (১৯৪১) এ বিজয় অভিযান সম্পর্কে একটি সুন্দর ও সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছেন–'লীগ বিজয় না দিগ বিজয়'।'সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে এটা ছাপা হয়। এবং আলাদাভাবে পুস্তিকা আকারে ছেপে তার কপি খেলার মাঠে বিতরণ করা হয়।"[১]

কাজী নজরুল ইসলামের ন্যায় সময়পন্থী কবিও মোহামেডান স্পোর্টিং এর লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া উপলক্ষে 'মোবারকবাদ'শীর্ষক একটি চমৎকার কবিতা লিখে জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন।[২]

গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে ড. খালেদ মাসুকে রসুল মন্তব্য করেছেন – "সমকালীন জাতীয় জীবনে যে কোন স্মরণীয় ঘটনায় কবি উদ্বুদ্ধ হতেন। নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করে কবিতা ও গান রচনা করতেন। জাতীয় জীবনের সেই প্রাণোচ্ছল যুগে তাঁর কবিতা ও গানে জাতি নতুন করে উদ্দীপনা লাভ করতো, পথের দিশা খুঁজে পেতো।"[৩]

গোলাম মোস্তফা রচিত ইসলামী গান, গজল, হামদ ও নাত–এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হল[৪]

১। " বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
সকল কাজের শুরুতে বল্
ওরে ও মুমিন মুসলিম॥"

২। "অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী
যতো গুণগান,, হে চির মহান,
তোমারি অন্তর্যামি॥"

৩। "হে খুদা দয়াময় রহমান–রাহিম।
হে বিরাট, হেমহান, হে অন্ত অসীম॥"

---

১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃ. ১৪১
২. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৩. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৪. গোলাম মোস্তফা রচিত ইসলামী গানসমূহ তাঁর গীতি সঞ্চয়ন ও তারানা–ই–পাকিস্তানে দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

৪। " নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মুহাম্মদ রসূল
কুল–মাখলুকাতের গুলবাগে
যেন একটি ফোটা ফুল ॥"

৫। "বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার
হে পরোয়ারদিগার।"
সিজ্‌দা লহ হাজার বার
হে পরোয়ারদিগার ॥"

৬। "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রসূল।
এই কলেমা পড়রে আমার পরান– বুলবুল॥"

৭। " নামাযের এই পাঁচ পিয়ালা গুলাবী শরবৎ।
দান করে তোর দিল্‌তাজা কর্‌, হে নবীর উম্মত॥"

৮। "ওগো মদীনা মনোয়ারা
কে বলে তুমি মরুভূমি
কে বলে তুমি সর্বহারা ॥"

এছাড়াও গীত সঞ্চয়নে কবি রচিত কিছু গান রয়েছে যা সে সময়ে গীত হয় তার প্রধান কয়েকটি উদ্ধৃত হলো ঃ

১. "সন্ধ্যারাণি সন্ধ্যারাণি"

২. "আজি মধুরাতে কেন নিদ নাহি আসে নয়নে"

৩. " সে তো মোর পানে কভু"

৪. "ওগো দখিন হাওয়া ওগো পথিক হাওয়া"

৫. "পিয়ার মোর চক্ষের।"

গোলাম মোস্তফা গানের ভক্ত ছিলেন। প্রায়ই তাঁর বাসায় সাহিত্য সভা, আলোচনাচক্র এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। কবির অমায়িক ব্যবহার ও আতিথ্যে কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা আকৃষ্ট হতেন। তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এবং তাজা কলম

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাত সুলেখক মোশাররফ হোসেন। তাঁরাও প্রায়ই এসে হাজির হতেন কবি গৃহে।[১] এ ছাড়াও তাঁর বাসায় আসতেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন, কবি বেনজীর আহমদ, কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন, কবি মঈনুদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, দেওয়ান আব্দুল হামিদ , শাহাবুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ প্রমুখ স্বনামধন্য কবি বিখ্যাতবর্গ।[২]

সাহিত্য বা সঙ্গীতের আসরের মনোরম পরিবেশ ছিল কবি গোলাম মোস্তফার বাসায়। সবাই একত্র হয়ে সব ভুলে প্রাণ খুলে হাসতেন। খাবার এর সাথে আড্ডা জমাতেন। এই বিষয়ে মাফরুহা চৌধুরী লিখেছেন– "ড্রয়িং রুমের একপাশে সাজানো যে পিয়ানো, সাহিত্য আলোচনা এবং নাশতার পর তার সামনের টুলে বসতেন কবি নিজে। গেয়ে উঠতেন গান– "তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে.....।" এরপর উপস্থিত বন্ধুদের অনুরোধে নিজের লেখা এবং নিজের সুরে গাইতেন–

"সে তো মোর পানে কভু
ফিরে চাহে না হায়–
তবু এ পরাণ কেন তারে পেতে চায়
সে কথা কহেনা
সে ব্যাথা সহে না
দলিয়া এ দিল মম
গেছে সে রাঙা পায়। ....."[৩]

---

১. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৯৭ [১২ বর্ষ, ৭–১২ সংখ্যা] পৃ. ৬৭
২. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৩. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

আরও গাইতেন–

"ফিরে চাও বারেক ফিরে চাও

দেখ, চোখ তুলে আমারে

বেদনা রঙীন হিয়া .....।"[১]

মাফরুহা চৌধুরী আরও লিখেছেন–"তিনি অধিকাংশ সময়েই গাইতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত অথবা নজরুল গীতি। নজরুলের একটি গান বুঝি তাঁর খুব প্রিয়। অনেকবার তাঁকে গাইতে শুনেছি।

"পথ চলিতে যদি চকিতে,

কভু দেখা হয় পরাণ প্রিয়

চাহিতে যেমন আগের দিনে

তেমনি মদির চোখে চাহিয়ো!"

বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে শেষ জীবনে প্রায়ই তিনি শয্যাশায়ী থাকতেন। বন্ধু–বান্ধব, অতিথি এলে আগের মত আর ড্রয়িং রুমে আসতে পারতেন না। তাঁর প্রিয় পিয়ানোর সামনেও বসতে পারতেন না। পিয়ানোটি ধূলো ময়লার হাত হতে রক্ষার জন্য পুরোপুরি মোটা আবরণে ঢাকা থাকত। ড্রয়িং রুমের সেই জৌলুশ, সেই প্রাণবন্ততা নেই– নীরব সব। কবি দিনের প্রায় সবখানি সময়ই বিছানায় থাকতেন। হাতের কাছে রাখা দু'চারখানা বই অথবা খবরের কাগজের পাতা ওল্টান মাঝে মাঝে।[২]

১. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার শেষ লেখা

গোলাম মোস্তফা ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (বর্তমানে বাংলা একাডেমী) কর্তৃক মনোনীত হন খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী রচনা করার জন্য। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড যখন খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী রচনা ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন গোলাম মোস্তফা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য। তার উপর এ গুরুভার অর্পিত হয় কারণ কবি ইতিপূর্বে বিশ্বনবীর রচনায় যে সফলতা লাভ করেন। সে প্রসঙ্গে মুহাম্মদ এনামুল হক লিখেছেন-

"১৯৬৩ সালের শেষ দিকে বৎসরে একজন করে চারি বৎসরে চারিজন খলিফার জীবনী রচনার এক বিশিষ্ট পরিকল্পনা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়। এই সময়ে ইহাও স্থির করা হয় যে, এই গ্রন্থগুলো খলিফাদের ঘটনাবহুল জীবনের নিছক তথ্যপঞ্জীরূপে লিখিত হইবে না, বরং তাহাদের জীবনের সহিত তথ্যনির্ভর, অথচ কাব্য ভঙ্গীতে লেখা সুখপাঠ্য জীবনী সাহিত্যরূপে রচিত হইবে। এই জাতীয় জীবনী সাহিত্যের যে আদর্শ বোর্ডের সম্মুখে ছিল, তাহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের রাসূলুল্লাহ-এর জীবনী 'বিশ্ব নবী' (প্রথম মুদ্রণ-১৯৪২ এবং অষ্টম সংস্করণ ১৯৬৩)। বলা বাহুল্য, খুলাফা-ই-রাশিদীন বা পুণ্যাত্মা খলিফা চতুষ্টয়ই রাসূল-ই-করীমের পবিত্র জীবনের স্বার্থক ব্যাখ্যা তাহা বলিয়া, 'বিশ্বনবীর' কাব্যিক ভঙ্গির অনুরূপ ভাষায় খলিফা চতুস্টয়ের জীবনের সহিত পূর্ব পাকিস্তানী পাঠককে নিবিড়ভাবে পরিচিত করিয়া তোলার জন্যই এই বিশিষ্ট পরিকল্পনাটি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ফলে 'বিশ্বনবীর' অনুকরণীয় ভাষায় চারি খলিফার জীবনী লেখার ভার 'বিশ্বনবী'র রচয়িতা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের হাতেই অর্পিত হয়।"[১]

বিশ্বনবী লিখার ২২ বৎসর পর কবি যখন এই জীবনী গ্রন্থ লিখার কাজে মনোনিবেশ করেন তখন চোখের ক্যাটারাক্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি শক্তি প্রায় ক্ষীণ ছিল। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তিনি শারীরিকভাবেও ছিলেন দুর্বল। তথাপি যখন তিনি এ কাজের দায়িত্বভার পেলেন তখন নতুন উদ্দীপনায় যেন তাঁর সারা শরীরের ক্লান্তি মুছে নিয়ে গেল। "আরবী, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজী অভিজ্ঞ পন্ডিতদের সঙ্গে এই সমস্ত ভাষায় হযরত আবূ বকর সম্বন্ধে লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থাদির আলোচনায় তিনি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে থাকেন। এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ ও লেখা পড়ার কাজে তিনি সর্বান্তকরণে নিজেকে নিবেদিত করেন।"[২]

---

১. কবি গোলাম মোস্তফা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

২. কবি গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ ছয় মাস সাধনার পর তিনি হযরত আবুবকর সম্বন্ধে যখন স্পষ্ট ধারণা আত্মস্থ করতে সক্ষম হন তখন তিনি লিখতে শুরু করেন। চোখে ছানি পড়ার কারণে চোখে কম দেখতেন। কোন রকম বাধাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারল না। দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবার কারণে তিনি শ্রুতলিপির সাহায্যে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) জীবনী লিখাতেন। এক এক অধ্যায়ের রচনা শেষে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের যাকে কাছে পেতেন তাকেই লিখিত অধ্যায়পড়ে শোনাতেন। তখন যে তার রচনার প্রশংসা করতেন তিনি এতে খুশি হয়ে উঠতেন এবং নতুন করে আরেক অধ্যায় রচনার জন্য প্রেরণা লাভ করতেন।

এভাবেই কবি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যান এবং এক সময় শেষের পথে প্রায় হঠাৎ পায়ে থ্রম্বসিস হবার কারণে তিনি ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন থাকেন। এরপর ১৯৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর এবং দিনটি ছিল সোমবার। হঠাৎ তাঁর মাথায় আসল যে, আজ যত কষ্টই হোক আমাকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জীবনী শেষ করতেই হবে। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। "সংকল্প অনুসারে শুধু খাবার দাবারের সময়টুকু বাদে তিনি সারাদিন শ্রুতলিপি দেবার কাজ চালিয়ে যান। রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। পুস্তকটির শেষ অধ্যায়ের রচনার সমাপ্তি হয়। অধ্যায়টি সমাপ্তির পর তিনি হাত তুলে আল্লাহর দরবারে শোকর জানালেন। এরপর তিনি " হাতড়াইতে হাতড়াইতে কলম লইয়া নিজের হাতেই পুস্তকটি তাহার কবিবন্ধু জসীম উদ্দীনকে উৎসর্গ করিলেন। মনে হইল এক মহান কর্তব্য সমাপ্তির প্রশান্তিতে কবি ডুবিয়া গিয়োছেন।"[১]

হযরত আবু বকর (রাঃ) গ্রন্থের প্রথমে কবি 'আরজ'-এ লিখেছেন যে–"বন্ধুবর ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক আমাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ জানান। এই প্রস্তাব আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি। আজ গ্রন্থ রচনার শেষে বুঝিতে পারিতেছি। অনেক পূর্বেই এই শুভকার্য সম্পন্ন করা আমার উচিত ছিল। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় অদৃশ্য লোক হইতে কোন সতর্ক অভিভাবক আমার গাফিলতির কথা যেন স্মরণ করাইয়া দিলেন, আমার অবহেলার জন্য আজ আমি সত্যই অনুতপ্ত। .. সুস্থ মন ও স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি লইয়া লিখিতে পারিলে হয়ত এই গ্রন্থ আরো নিখুঁত ও সুন্দর হইত।[২] কারণ তিনি বিশ্বনবীর লেখা সমাপ্তির পর হতেই খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী লেখার সুযোগ খুঁজছিলেন। আর বোর্ড কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তাঁকে সে সুযোগ প্রদান করেছিল।

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন, প্রেক্ষণ, এপ্রিল-জুন '৯৮, পৃ. ৫৬

২. গোলাম মোস্তফা, হযরত আবু বকর(রাঃ), আরজ ১৯৯৬ইং পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর সোমবারই ছিল কবির কর্মময় জীবনের সমাপ্তির দিন। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দি তিনি নিজকে সাহিত্য সাধনার সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন। কেউই জানতা যে, সেই দিনটিই কবির শেষ লেখার দিন। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীর এক চতুর্থাংশ তিনি শেষ করেছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের ও ডাক্তারের শত নিষেধের কোন কিছুই তাকে অন্তিম কার্য সম্পাদনে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি এই বইটির প্রকাশনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তাই এটিই ছিল গোলাম মোস্তফার শেষ রচনা। হযরত আবু বকর (রাঃ) গ্রন্থটি লিখা শেষ করে গোলাম মোস্তফা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। আর তাই রাত দশটার পর খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনী গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ কাজ সমাপ্তির প্রশান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত বারোটার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় থ্রম্বসিস বা রক্তস্তম্ভন রোগে পুণর্বার আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। আর তাঁর সংজ্ঞা ফেরেনি। অতঃপর ছয়ই অক্টোবর বিকেলে কবিকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করানো হয়। কবি যেন নীরবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলেন– "আমার জীবনের শেষ কর্তব্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ কাজই শেষ করিয়াছি, অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ রাখিয়া আমি কিছুতেই জগত ত্যাগ করিব না।"[১]

১. খন্দকার আব্দুল মোমেন, প্রেক্ষণ এপ্রিল-জুন '৯৮, সংখ্যা, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য স্বীকৃতি

কবি গোলাম মোস্তফা অর্ধশতক ধরে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সাহিত্য সেবা করেছেন। সাহিত্য,সংস্কৃতিতে তাঁর এই অবাধ বিচরণের ফলে তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ সত্ত্বেও তিনি কবি হিসেবেই অধিক পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৫২ সালে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক তিনি 'কাব্য সুধাকর'উপাধি লাভ করেন।[১] ১৯৫৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৯৬০ সালে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে"সিতারা–ই–ইমতিয়াজ"খেতাব পান। President's Medal for pride of performance in Bengali এবং ১৯৬১ সালে আবার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি জীবদ্দশায়ই দেশের বহু সাহিত্য,শিক্ষা,সাংস্কৃতিক সংগঠন হতে সংবর্ধনা ও সম্মান পান। সাধারণের নিকট তিনি খ্যাত ছিলেন পাকিস্তানের 'বুলবুল' হিসেবে।[২]

ইসলামের সেবায় সাহিত্য সাধনা এবং প্রধানতঃ বিশ্ব নবী রচনার জন্য ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অমর গোলাম মোস্তফাকে সিরাত গ্রন্থ বিষয়ে ১৪০৪ হিজরীর ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করেন।[৩](কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা ঃ যশোর সমিতি–ঢাকা;আশরাফুল হাবীব ফিরোজ সম্পাদিত)

পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি
জনাব গোলাম মোস্তফা সাহেবের
৫৫ তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে
অভিনন্দন

হে কবি,

তোমার সুধামাখা কাব্যরসে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল হইতে তুমি একনিষ্টভাবে বাঙ্গলা ভাষার সেবা করিয়া আসিতেছ। তোমার কাব্যে ঝঙ্কৃত হইয়াছে নবজীবনের গান;নব ছন্দে নব সুরে জীবন ভরিয়া তুমি শুনাইয়া আসিতেছ জাগরণের বাণী;দেশ ও জাতির প্রাণে দিয়াছ অফুরন্ত প্রেরণা। সত্য,সুন্দর ও মঙ্গলের প্রকাশ, উদার বিশ্ববোধ

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩. খন্দকার আব্দুর মোমেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

এবং সার্বজনীনতা তোমার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তোমায় কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়ের সুর। আমাদের চলার পথে তোমার কাব্য দিয়াছে আলো ও ইঙ্গিত। এই কাব্য–সাফল্যের জন্য আজ আমরা'যশোহর সাহিত্য–সংঘের পক্ষ হইতে তোমাকে আমাদের পরিপূর্ণ প্রাণের অভিনন্দন দান করিতেছি।

তোমার 'বিশ্বনবী' বাঙ্গলা–সাহিত্যে এক অপূর্ব অবদান। এই অনুপম গ্রন্থ তোমাকে অমরতা দান করিবে।

তরুণ 'কিশোর'দের তুমি প্রিয় কবি;তাহাদের চোখে দিয়াছ তুমি রঙিন স্বপ্ন;নওযোয়ানদের প্রাণে দিয়াছ বলিষ্ঠ মনোবল; নারীজতিকে শুনাইয়াছ তুমি নবজাগরণের গান। ছন্দে–গানে–কাব্যে তোমার প্রতিভা স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছে। এজন্য সত্যই আমরা আজ গৌরবান্বিত।

পাকিস্তানের তুমি অন্যতম স্বাপ্নিক। তোমার চিন্তা, ধ্যান ও ধারণা দিয়া পাকিস্তানের আর্দশকে তুমি করিয়াছ সুন্দর ও মহিমান্বিত। তোমার 'কওমী–নিশানে'র গান, 'আনসার'দের গান এবং অন্যান্য বহু পাকিস্তানী সঙ্গীত তমদ্দুনিক পাকিস্তান–রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এদিক দিয়াও তুমি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

কবিরা দেশের গৌরব;কবিত্ব দেশের সম্পদ। কবিত্বের প্রভাবে দেশ প্রেরণা লাভ করে; দেশের আযাদী, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়। তোমার কাব্যে আছে তাহারই বিপুল সম্ভাবনা। তোমার আদর্শ আমাদের পাকিস্তানকে তাই চির–কল্যাণে অভিসিক্ত করিবে।

ইসলামের মর্মবাণীর অভিব্যঞ্জনা তোমার কাব্যের আর এক বৈশিষ্ট্য। তোমার কাব্যে পাই আমরা ইসলামী কৃষ্টির সুন্দর রূপায়ণ ও সত্যিকার পরিচয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহাও তোমার এক গৌরবময় দান।

মহাকবি মাইকেলের স্বদেশ–প্রেরণা,মহাত্মা শিশির কুমার ও গরীব পীর ধর্ম–সাধনা যশোহরের গৌরব। সেই দেশে তোমার মত মনীষীর আবির্ভাব সত্যই আমাদিগকে নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

তুমি কবি,তুমি দেশপ্রাণ;হিন্দু–মুসলিম সবাইকে তুমি ভালবাস, তোমার জয় হউক। দিন যায়,কীর্তি রহে। তুমি কীর্তিমান,তোমার আবির্ভাব আছে,তিরোধান নাই। দেশবাসীর প্রাণের আসনে তুমি চির–অম্লান রহিবে। তোমার দীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি।

'যশোহর সাহিত্য–সংঘের' পক্ষ হইতে আমরা তোমার ৫৫ তম জন্মদিনে আজ তাই তোমাকে "কবি–সুধাকর"মানপত্র দানে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছি। হে কবি, আমাদের এই অন্তরের অভিনন্দন ও মানপত্র গ্রহণ কর। ইতি –

তোমার গুণমুগ্ধ
যশোর সাহিত্য–সংঘের সদস্যবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

কবি গোলাম মোস্তফার
শুভ আগমনে
সাদর সম্ভাষণ।

কবি!

তোমার প্রতিভার স্নিগ্ধ মাধুরী আমাদের মনের সোপানে সোপানে রেখাপাত করেছে,এঁকে দিয়েছে অপরূপ আলপনা। পাকিস্তানের গুলবাগিচায় তোমার কবিতা ফুল হ'য়ে ফুটছে। পাকিস্তানের কিশোর,কিশোরী,পদ্মার ঢেউ,সবুজ ধানের কচি মসৃন চঞ্চলতা নিয়ে তুমি যে স্বপ্ন রচনা করেছ তা অপূর্ব। তোমার রচনায় তাই একদিকে ফুটেছে আজাদীর প্রতি গভীর দরদ আর একদিকে সুক্ষ্ম চারুশিল্প যা শুধু কবি মানসের দান। মনে পড়ে 'শিল্পী যাহার আঁকল ছবি–

"কবি যাহার গাইল গান
রূপ ধ'রে সেই আস্‌লরে ভাই
ধ্যানের ছবি পাকিস্তান।"

আমাদের মনের কিশলয়দল তোমার সরস কবিকল্পনার পুলক মদিরা সিঞ্চনে আকুল হ'য়ে উঠছে ফুটবার জন্য। অমিয় কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই।

'সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো'
অরুণ রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটবো গো।

তোমায় সালাম জানাই,আমাদের তরুণ মনের অনুরাগে–রাঙা প্রীতি পূর্ণ সম্ভাষণ গ্রহণ কর।

নবী প্রেমিক!

আমাদের জীবন পথ নির্দেশকারী রসূলে নবী মোহাম্মদ (দঃ)কে তুমি ভালোবেসেছ। তাঁর জীবনের ঘটনার ঘাটে ঘাটে ছুইয়ে দিয়েছ তোমার সাহিত্যিকভাব ও ভাষার পরশ। তোমার 'বিশ্ব নবী'আর 'মরুদুলাল'হ'ল ধর্মসুরার সোনার ভৃঙ্গার। নবীর জীবনের সৌন্দর্য্য ও মহিমাকে জান্‌তে হ'লে তোমার এই শিরিণ শারাবের দোসর নেই। বিজ্ঞান,দর্শন,রাজনীতি ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববোধের ভিতর দিয়ে নবী জীবনের রূপায়ণ তোমার অপূর্ব দান। নবী বয়ে এনেছিল আল্লার বাণী আরবের ভাষায় তাকে তুমি আমাদের ভাষায় অনূদিত করে সুযোগ দিতে চাইছ আমাদেরকেও সেই অমৃতবাণীর মনোজ্ঞ স্বাদ পেতে।

সুর সাধক!

পাকিস্তানের অঙ্গন তলে আজ তোমার বাঁশরী সুর তুলেছে বিচিত্র হিল্লোলে। পাকিস্তানীর অন্তরের ঘুমন্ত মনটিকে তুমি জাগিয়ে তুলেছ সুরের মায়াময় প্রেরণায় 'সঙ্গীত শত্রুকে মিত্র করে'তুমি তার তাৎপর্য নিয়েছ।সেই আদর্শেই তোমার সুর সাধনা কামিয়াবীর পথে এগিয়ে চলুক,এই কামনা করি।

মানিকগঞ্জ
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ৫০

তোমার গুণমুগ্ধ
দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র–ছাত্রী
মানিকগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

কবির ৫৫তম জন্ম-বার্ষিকীতে দৈনিক আজাদের সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁ ও কবি জসীমউদ্দিন বাণী দিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা লিখেছিলেন–

– মোহম্মদ আকরম খাঁ

মাননীয়,

'যশোহর সাহিত্য সংঘের'সম্পাদক মহাশয়–

আদাব গ্রহণ করিবেন। সংঘের পক্ষ হইতে যশোহরের সুসন্তান জনাব কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবকে সম্বর্ধনা জানাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে শুনিয়া যাহার পর নাই আনন্দিত হইলাম। কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় বহু দিনের,তাঁহার কবি–প্রতিভার সহিতও আমার অল্প–বিস্তর পরিচয় আছে। এ অবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করাই আমার উচিত ছিল! কিন্তু নানা করণে বিশেষতঃশারীরিক অপটুতার জন্য সেই আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইল। এ জন্য দূঃখ প্রকাশ করিতেছি এবং যশোহরবাসীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া দীর্ঘ জীবন ও সাহিত্য–সাধনার পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

–জসীম উদ্দিন

হে কবি। আমাদের বিগত অন্ধকার যুগের আকাশে যাঁহারা আলোকবর্ত্তিকা হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া–ছিলেন,তুমি তাহাদেরই একজন। তোমার শুভ–জন্মদিনে আজ তোমাকে তসলিম জানাই।

তোমার উদয় আমাদের অন্তরে আনিয়া দিয়াছিল আত্ম–বিশ্বাস–আত্ম–প্রত্যয়। তোমার সাহিত্য শুধু আমাদের আশা–আকাঙ্খার কথাই ঘোষণা করিয়াছিল। তাই তোমাকে সালাম জানাই।

আজ তোমার জন্মদিনে আর–এক যুগের কবির কাছে তুমি তাহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিও। তোমার কন্টক পরিষ্কার করিয়া যে–পথিক মানুষকে চলার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলে, সেই পথে আজ আমরা চলিতেছি। হে পুরোধা। তুমি আমার সালাম গ্রহণ কর।

তোমার স্বপ্ন সুদূর খর্জ্জুর বন–ছায়ায় অমর কাহিনী রচনা করিয়াছে। সেই কাহিনীকে আনিয়া তুমি জনসাধারণের অন্তরে ভরিয়া দাও। হে কবি! তোমাকে তসলিম।

Dhaka University Institutional Repository

কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের
চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে-
অভিনন্দন

কবি,

গত পঁচিশ বছরের উর্দ্ধকাল থেকে আপনি বাংলা ভাষা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। আমাদের জাতীয় জীবন ও বাংলা সাহিত্যের এই পঁচিশ বছরের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ইতিহাস নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষুতা, প্রতিকুল আর্দশের ঘাত-প্রতিঘাত ও নানা অবাঞ্ছিত ঝড় ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়েই আমাদের এই পঁচিশ বছরের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষে এইটি আনন্দ ও গর্ব্বের কথা যে, এই সহস্র বিক্ষুব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও আপনি কখনো আপনার আদর্শচ্যুত হন্‌নি। সাহিত্য-সেবা এখনো আমাদের দেশে গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের বাহন হয়, তবুও জীবন প্রভাতে এই উপেক্ষিত বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে এখনো তার সেবা করে আসছেন। এই সেবা ও সাধনায় আপনি কতখানি সফলতা লাভ করেছেন, বঙ্গ সাহিত্যের অন্যান্য সেবক ও সাধকের তুলনায় আপনার কৃতিত্ব কতখানি তার বিচার করবার দিন আজ নয়, আজ শুধু আমরা এই একনিষ্ঠ সাধনা ও স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের জন্যে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাতে সমবেত হয়েছি।

কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এঁরা জাতির জীবনে বিধাতার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ-এরাঁ প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের উদগাতা, মানব জীবনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আদর্শের এঁরা বাহন ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি জাতির চলার পথে করেন অপূর্ব আলোক সম্পাত,-কবি, আমরা আপনার সাহিত্যে মানুষের হৃদয় ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যময় প্রকাশ, মানবাদর্শের অভিব্যক্তি ও আমাদের তরুণদের পথ চলার নির্দেশ দেখ্‌তে পেয়েছি, তাই আজ বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত এই জেলাবাসী সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষ থেকে আপনাকে আমরা আমাদের প্রীতি পূর্ণ অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি। ইতি-

চট্টগ্রাম,
৩রা চৈত্র, ১৩৪৪ বাং

গুণমুগ্ধ
চট্টগ্রাম সাহিত্য-মজলিসের সভ্যবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বুলবুল্ স্বনামধন্য
কবি গোলাম মোস্তফা,বি-এ,বি-টি,সাহেবকে
অভিনন্দন

ওগো বিশ্বদরদি–মুসলিম কাব্য–জগতের একনিষ্ঠ সাধক,নবযুগের অগ্রদূত,তোমার কাব্য–প্রতিভায় আজ সমগ্র বাংলা আলোকিত। তোমার কবিতায়–আকাশের তারা কাঁদে,–কচি মুখে হাসি ফোটে,–বনানী মাথা নোয়ায়,–তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

তুমি'রক্তরাগ'খোশ্‌রোজে'অতীত জাতীয় গৌরবকে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করে আমাদের বিস্মৃত স্বরূপটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে নিরাশ প্রাণে নই–আমরা অতীতের বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

এতদিন দূর থেকে তোমার'হাস্‌নাহেনা'র গন্ধে 'সাহারা'র শুক্‌নো ফুলে 'ভাঙ্গাবুকে'বুক মিশিয়ে তোমায় তস্‌লিম জানিয়েছি–আজ কাছে পেয়ে মনে হয়–'তুমি নাই.মোরা নাই,নিশ্চিহ্ন হইয়া বুঝি মুছে গেছে সব।' তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

ওগো বুল্‌বুল্ তোমার রচা গানে,তোমার দে'য়া সুরে,তোমার দে'য়া তালে,আজ সারা বাংলা মুখরিত.–সুরের মূর্চ্ছনায়–সে গানের ভাবে আমাদের কচি প্রাণ উন্মাদ। তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

ল্যান্সডাউন হল,
কুচবিহার;
২০–৩–৩৮।

গুণমুগ্ধ
মুছলমান ছাত্রবৃন্দ,
কুচবিহার।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মূল্যায়ন ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন

বাংলা সাহিত্যে তখন মুসলমানদের প্রবেশ একরকম ঘটেনি বললেই চলে। পুঁথি সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যরীতিতে অভিষিক্ত তখন গুটি কয়েক মুসলিম কবি। এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ঐতিহ্য হতে মধুকণা আহরণ করে রচনাশৈলীর বিশিষ্টতায় কবি গোলাম মোস্তফা বাক্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। তাঁর কাব্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল পাঠকের মনোরঞ্জণ করে। এদিক থেকে কবি গোলাম মোস্তফা বাঙালি মুসলিম কবিদের ভেতর তখনকার সময়ে 'আধুনিক' আন্দোলনের অগ্রণী কবি। বর্তমান কাব্যের ক্রমিক অগ্রসরতায় 'আধুনিকের' সংজ্ঞা অন্যরূপ এবং কাব্যশৈলী ও কাব্যাদর্শও ভিন্ন প্রকৃতির' কিন্তু সে যুগে কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন অন্যতম আধুনিক কবি এবং বাঙালি মুসলিমগণের ভেতর নতুন ধারার কাব্য চেতনা সৃষ্টিতে তাঁর দান অপরিসীম।[১]

কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন একজন উদার চরিত্রের কবি ব্যক্তিত্ব । পাকিস্তানের সমর্থক হওয়া আর সাম্প্রদায়িক হওয়া এক কথা নয়। সে দিনের বহু নেতা ও লেখক পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন যাঁরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন। কালের বিবর্তনে এটা ঘটেছে। অতএব এ জন্যে গোলাম মোস্তফাকে দায়ী করা যায় না। এ কথা ঠিক যে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সমর্থক ছিলেন এবং পাকিস্তানের জন্য তিনি তাঁর লেখালেখি চালিয়েছেন। কিন্তু একজন মানুষকে, বিশেষ করে কবি ও লেখককে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর কালে অবশ্যই বিচারে আনতে হবে। কবি গোলাম মোস্তফা পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর ১৯৬৪ইং সালে ইন্তেকাল করেন, অর্থাৎ তখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু হয়নি। অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ঐ সময় সকল কবি সাহিত্যকসহ দেশের সকল মানুষই পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে কবিকে সেই দোষে দুষ্ট করা চলে কি ?[২]

---

১. মোস্তফা কামাল, গোলাম মোস্তফাঃ কবি ও মানুষ, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, ফিরোজা খাতুন, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৬৮ ইং, পৃ. ১৪০

২. নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ইং, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, তাঁকে অনুদার বা সংকীর্ণ বলে চিহ্নিত করা অসংগত হবে। কর্ম ও জ্ঞানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট এই চেতনা ব্যাপক সহানুভূতিত দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। নিজের কালের রুচি শিক্ষা–আদর্শের সঙ্গে হালের দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। সেই উপলব্ধির পরিণত বেদনা যে উদার আবেগোষ্ণ অন্তরঙ্গতার সংগে তিনি ব্যক্ত করেছেন তা যেন মুত্যুর পর ওপার থেকে ভেসে আসা কোনো অমর মহাকবি বাণীর মতই চিরকাল আমাদের আত্ম পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে। সেই বাণী উদ্বৃত করেই আমরা মরহুম গোলাম মোস্তফার স্মৃতি উদযাপন সম্পূর্ণ করি ।[১]

তিনি নূতন পুরাতনের পার্থক্য সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেতন তার নমুনা হলা– "তরুণ ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা কোথায় ? কে তরুণ ? কে পুরাতন ? তরুণ পুরাতনের Defination কি ? কোথায় উহাদের সীমারেখা ? উহাদের line of demarketion ? ––– এই একটানা জীবন স্রোতের কোন খানিকে প্রাচীন বলিব ? এই মুহূর্তে যে নূতন, পর মুহূর্তেই সে যখন পুরাতন, তখন পুরাতনকে গালাগালি দেওয়া কি নূতনের শোভা পায় ?" [২]

গোলাম মোস্তফা অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক কবি ছিলেন। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন, তুমি যশোরের নও পাকিস্তানের ।––– কবি হিন্দু, না মুসলমান , না খৃষ্টান সে প্রশ্ন কেউ করে না। সত্য সুন্দর এমনি করে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের গন্ডী পেরিয়ে গিয়ে বিশ্বজনীন হয়। তাজমহল আজ আর শাহজাহানের নয় সারাজাহানের । ব্যক্তির চিন্তা বা শিল্প সৃষ্টি এমনি করে বিশ্ব মানুষের মনের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই জন্যই হোমার, ভার্জিল , বাল্মিকী, সাদী, হাফিজ, রুমী, দান্তে, মিল্টন, সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল সবই আজ বিশ্ব কবি।[৩]

গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি

১. মুনীর চৌধুরী, কবি গোলাম মোস্তফা ঃ সংগ্রহ ও সম্পাদনা, মাহফুজা খাতুন, বাংলা একাডেমী ঃ বর্ধমান হাউস, ঢাকা –১৯৬৮ইং, পৃ. ৮৮

২. গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৬২ ইং, পৃ. ১০৬ – ১০৭

৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়েও সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।[১] এছাড়া রবীন্দ্র নাথকে কবিতাও লিখেছেন। যেমন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর শিরানামের কবিতায় কবি লিখেছেন –

"রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর
ধারালো মেধা চাকুর,
মুকুট সকল কবির,
বাণীর সাগর গভীর
সকাল সাঁঝের স্মরণ
বরণ করি চরণ ।" [২]

তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামের নিম্নের কবিতাটিও লিখেছেন –

"আকাশ ভুবণে বসেছে যাদুর মেলা
নিতি নব নব লিখিতেছে যাদুকর
রবি–শশী–তারা–ঝঞ্ঝা– অশনি– খেলা,
লুকোচুরি কতো চলিছে নিরন্তর।
আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারা বেলা
কিছু বুঝি নাকো বিস্মিত অন্তর !
হাসা–কাঁদা আর ভাঙগা–গড়া হেলা–ফেলা
সকলেরি মাঝে ভরা যাদু – মন্তর !
করি ! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
পিতার ঘরের অনেক খবর জানো,
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে,
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো !
দর্শক মোরা ! কিন্তু জানাশোনা নাই,
যাহা বলো, শুনি অবাক হইয়া তাই !" [৩]

কবিতাটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ মন্তব্য করে

১. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
২. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৩. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন–'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি অসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত যে অসংখ্য কবিতা লেখা হয়েছে এটি তার মধ্যকার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি।[১] কবি গোলাম মোস্তফার এহেন হিন্দু প্রীতি (?) সমকালের কোন কোন মুসলিম কবি সাহিত্যিক ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।[২]

যশোরের খ্যাতনামা কবি গোলাম হোসেন তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন – কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব অনেক দিন পূর্বে একবার 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ স্তুতি গেয়েছিলেন। স্তুতি নয় একেবারে ঋষিপূজা। আমি 'ইস্লাম দর্শন' পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করেছিলাম। মন্তব্যভাগে লিখেছিলাম সন ১৩৩১ সালের 'প্রবাসী পত্রিকার' ভাদ্র সংখ্যায় কবি গোলাম মোস্তফা বি,এ,বি, টি সাহেব রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া প্রচার করেন। ইহাকে কবিতা না বলিয়া বরং বন্দনার স্তোত্র ভক্তপ্রাণের অভিব্যক্তি, ভক্তির ফোয়ারা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একদল তরুণ মুস্লিম–কবি সমাজে বর্তমান যুগে দেখা দিয়াছেন। ইহারা ইসলামের আধ্যাত্মবাদ, সুফীতত্ত্ব বা মারফৎ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। তাই হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীর কবিতায় আধ্যাত্মতত্ত্ব বা দার্শনিক কোন উচ্চভাব দেখিলেই ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া স্তাবক বা পূজারীর মত সেই লেখক বা কবির বন্দনা গাহিয়া, ছন্দোময়ী প্রাণের আবেগভরা ভাষায় নিতান্ত ভক্তিভরে তার চরণ প্রান্তে ভক্তির অঞ্জলি দান করিয়া নিজকে কৃতার্থ, পরম চরিতার্থ জীবনকে মহাধন্য মনে করেন! বর্তমান কবিতাটি তাহার পূর্ণ আদর্শ, আলোচ্য কবিতায় আমাদের মুসলিম কবি ভায়া রবীন্দ্র নাথকে মায়াবীর ছোট পুত্র বলে প্রশংসা করিয়াছেন।"[৩]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ "গোলাম মোস্তফা স্মরণে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন–"কবি গোলাম মোস্তফা মনে প্রাণে মুসলিম কবি। এ দিক দিয়ে তাঁকে তাঁর অগ্রসূরী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর ভাবশিষ্য বলা যেতে পারে। শিরাজী সাহেব আজীবন ওজস্বিনী বক্তৃতা, উদ্দীপনাময়ী কবিতা এবং তেজগর্ভ উপন্যাস ও প্রবন্ধ মালার দ্বারা অবহেলিত ও অবসাদগ্রস্ত মুসলিম

১. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৮
২. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৮
৩. মুহম্মদ আবু তালিব, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, আত্মজীবনী ও সাহিত্য সাধনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ ইং, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রবলতর ও চোখ জলসানো হিন্দু কৃষ্টির আওতা হতে মুক্ত করে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে গেছেন। গোলাম মোস্তফার জীবন ও লক্ষ্য ছিল পারিপার্শ্বিক অনগ্রসর মুসলিম সমাজের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করা, শুধু প্রাণ নয়, ইসলামী প্রাণ সঞ্চার করা ।[১]

কবি সাহিত্যিকদের ভেতর কবি গোলাম মোস্তফার মত স্বাধীনচেতা ও সাহসী মানুষ খুব কম দেখা যায়। পাকিস্তান অর্জনের পর কোন কোন বুদ্ধিজীবীকে সুযোগ ও সময়মত অভিমত পরিবর্তন করতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে উদ্দেশ্যহীনতার দেশের সুধীদের চিন্তায় ও কর্মে বিভ্রান্তি এসেছে যারা সুযোগ বুঝে মত পরিবর্তন করেননি। অনেক সময় সুবিধা লাভের আশায় তাঁরা মৌন থাকাই শ্রেয় ঃ মনে করেছেন মাত্র। কবি গোলাম মোস্তফা ও আর কিছু সংখ্যক কবি সাহিত্যিক রয়েছেন যারা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভ বা বিক্ষোভের ভয়ে নিজেদের মতামত গোপন করলেন না বা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। আমি তাকে বাংলাদেশের কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান ব্যক্তি বলে মনে করি। হাওয়ার সাথে তিনি ঝুঁকে পড়েননি। যেটাকে সত্য বলে তিনি জেনেছেন সেটা প্রকাশ্যে বলার বা লেখার সৎ সাহস তাঁর ছিল । সে সব মতামতের সাথে স্বাভাবিকভাবেই অনেকের অনেক ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কিন্তু এসব মতামত প্রকাশ করার সাহস ও নির্ভীকতা তাঁর চরিত্রের বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর।[২]

সমকালীন কোন কোন মুসলিম সাহিত্যিক প্রতিবেশী সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য অনায়াসে জাতীয় সত্য বিসর্জন দিয়েছেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ বুদ্ধির মুক্তি নামে 'শিখা', পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম মুসলিম ধর্মীয় অনুভূতিতে অনেক ক্ষেত্রে প্রচন্ড আঘাত হেনেছে। কিন্তু তিনি তাদের শ্রদ্ধা করতে পারেননি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হতে অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই তখন মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাথে হাত মিলিয়েছেন কিন্তু গোলাম মোস্তফা কখনোই তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষেননি। তিনি আজীবন ইসলামী ভূবণেই বাস করেছেন।[৩]

---

১. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা স্মরণে ঃ কবি গোলাম মোস্তফা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা ঃ ফিরোজা খাতুন, বর্ধমান হাউস ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ ইং, পৃ – ১৪

২. মোস্তফা কামাল, গোলাম মোস্তফা, কবি ও মানুষ, সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন, বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস, ১৯৬৮ ইং, পৃ. ১৪২

১. ডঃ খালেদ মাসুকে রসুল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে কবি জসীম উদ্দীন লিখেছেন –"রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী" কাব্যে কতগুলি একদেশ দর্শী ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কবি কল্পিত গাথা ও যে সকল কাহিনী কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রতি উত্তরে কবি গোলাম মোস্তফা অনেকগুলি কাহিনী কাব্য রচনা করিয়া আপন সমাজের মুসলমান ভাইদের মধ্যে আত্ম প্রত্যয় জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু সমাজ যে বখতিয়ার খিলজীর নাম পর্যন্ত শুনিতে পারেন না, সেই বখ্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের উপর তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে নজরুলের কাব্যে যদিও বিদেশী বহু মুসলিম বীরের প্রশংসা রচিত হইয়াছে। ভারত ইতিহাসের কোন মুসলিম বীরের প্রশস্তি এখানে বিশেষ স্থান পায় নাই। কারণ বিগত যুগের হিন্দু লেখকেরা তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে ভারত ইতিহাসের বহু মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া আঁকিয়াছেন। হয়তো নজরুল তাঁহাদের কোন প্রশস্তি রচনা করিয়া হিন্দু সমাজের বিরাগ ভাজন হইতে চান নাই।"[১]

এ ছাড়াও কবি হিসাবে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনের ডাকেও সাড়া দিয়েছেন, সভাপতি, প্রধান অতিথি, আলোচক, ইত্যাদি বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেও জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর মূল্যায়ন পথ নির্দেশনা দান করেছেন।[২] মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ এ ব্যাপারে বলেন– " সমাজের জন্য কবির কতখানি দরদ ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলেন ১৯২৪ সনে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রক্ষণকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার ভিতর। এ সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (তখন অবশ্যই ডক্টর হননি) কলকাতা ছেড়ে সম্ভবতঃ ঢাকায় আসেন। কাজী আবদুল ওদুদ ও চাকুরী নিয়ে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খান (তখন অধ্যক্ষ হননি)। 'ল' পাস করে ময়মনসিংহ যান। কবি গোলাম মোজাম্মেল হক (বরিশালী) নিজস্ব পাবলিকেশন কোম্পানী খুলে তাই নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। এইভাবেই পুরাতন উদ্যোগী সদস্যগণ সকলেই দূরে যাওয়ায় সমিতি অচল হয়ে পড়ে। বাড়ি ভাড়ার দায়ে তার লাইব্রেরী নিলামে উঠে। তখন অবশিষ্ট সভ্যেরা লাইব্রেরীর মূল্যবান বইগুলি মীর্জাপুর স্ট্রীটের এক বাড়ীতে সরিয়ে এনে কোন মতে রক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সমিতি চালাতে

১. জসীম উদ্দীন, গোলাম মোস্তফার কবিতা, কবি গোলাম মোস্তফা ঃ সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন, বাংলা একাডেমী ঃ বর্ধমান হাউস, ঢাকা ১৯৬৮ইং, পৃ. ২২

২. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

হলে অর্থের তো প্রয়োজন। কবি তখন হুগলী জেলা স্কুলে চাকরি করেন। সভ্যরা তাঁকেই সম্পাদক করে অর্থের চেষ্টায় বের হন। কবি প্রতি রবিবারে হুগলী হতে কলকাতা এসে সমিতির জন্য পরিশ্রম করতেন। এর দু 'বছর পূর্বে আমি কলকাতা ছেড়েছিলাম। নূতন চাকুরী পেয়ে আবার কলকাতায় বাসা নেই। অতঃপর কবির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে আমি নিজে এবং আরও কতিপয় সদস্য কবির সঙ্গে চাঁদার খাতা নিয়ে কলকাতায় সাহিত্যমোদী ও শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি।" [১]

১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে সঙ্গীত শাখার সভাপতি ছিলেন গোলাম মোস্তফা।[২]এই প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন– " সঙ্গীত শাখার সভাপতি কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব সঙ্গীত সম্পর্কে যে ভাষণটি দেন, তা ছিল তত্ত্বে ও তথ্যে সঙ্গীতের ধারার বিশ্লেষণে খুবই সুন্দর। তিনি মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞদের সাধনার ধারা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন।[৩] ১৯৪১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনেও গোলাম মোস্তফা কাব্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন।[৪] এই প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন – "কবি গোলাম মোস্তফা কাব্য সাহিত্য শাখায় সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। তিনি মুসলমান কবিগণকে তাদের কাব্যসৃষ্টিকে ইসলামী রঙ্গে রঞ্জিত করতে আহবান জানান। তিনি বলেন হিন্দু কবিদের অনুকরণ নয়। বরং মুসলমানদের বিশিষ্ট অনুভূতির রুপায়ণেই মুসলিম কাব্য সাধনা সার্থক ও স্বকীয়তামন্ডিত হবে।[৫]

১৯৫৫ সালের শেষের দিকে বরিশালে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্। কবি গোলাম মোস্তফা, কবি মঈনউদ্দীন, শিল্পী আব্বাস উদ্দীন এবং আরো অনেক খ্যাতনামা

---

১. মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা স্মরণে ঃ কবি গোলাম মোস্তফা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, ফিরোজা খাতুন, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ ঢাকা, ১৯৬৮ইং, পৃ. ১৬

২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ইং, পৃ. ৩৭

৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ১৭১

৪. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার । উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তদানীন্তন মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক। তিনদিন ব্যাপী সভায় কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর প্রবন্ধ ও কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশ করে অতিথিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হয়ে পড়েন।[১]

১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামের অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত শ্রোতাদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিয়েছিলেন কবি গোলাম মোস্তফার স্বকণ্ঠে গাওয়া কয়েকটি সঙ্গীত।[২] ১৯৫৯ সালে করাচীতে লেখক সংঘ সংগঠনের সময় এবং ১৯৬১ সালে দিল্লীতে ইন্দো-পাক কালচারাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার সমপূর্ব পাকিস্তান হতে যারা আমন্ত্রিত হন তাঁদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন অন্যতম।[৩] তিনি পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৯৬১ সালের ২৭শে নভেম্বর হতে ১৬ই ডিসেম্বর তিন সপ্তাহের জন্য কলম্বো যান ইউনেস্কোর আঞ্চলিক এক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতে । কবি এই সেমিনারের বিভিন্ন পর্বসহ সমাপ্তি অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। কবি গোলাম মোস্তফা কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে ১৯৩৯ সালের ৬ ও ৭ই মে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন -এর ৬ষ্ঠ অধিবেশন এর সঙ্গীত জলসায় সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক।[৪]

বিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে ঢাকায় রেঁনেসা সোসাইটি, পাকিস্তান মজলিস, রওনক, পাকিস্তান রাইটার্স গীল্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও গোলাম মোস্তফা ছিলেন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'পি-ই-এন এর কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শাখা এবং পূর্ব পাকিস্তান শাখারও তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মকর্তা।[৫]

---

১. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, গোলাম মোস্তফা স্মরণে ঃ কবি গোলাম মোস্তফা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন, বাংলা একাডেমী ঃ বর্ধমান হাউস, ঢাকা, পৃ. ১৬

২. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৭ইং, পৃ. ৩৭

৩. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৫. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭ - ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মোস্তফার বাসভবন ও ঢাকাস্থ শান্তিনগরের 'মোস্তফা মঞ্জিল' এ সাহিত্য সভা, আলোচনা চক্র এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও প্রায়ই আয়োজন করা হত। গোলাম মোস্তফার অমায়িক ব্যবহার ও উদার আতিথ্যে ' মোস্তফা মঞ্জিল' পরিণত হয়েছিল কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সূধীবৃন্দের এক আকর্ষণ কেন্দ্রে।[১]

সৈয়দ আলী আহসান গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে বলেছেন–যে সময় বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে দীক্ষিত কিছু সংখ্যক কবি এবং সাহিত্যিক 'অনাথ' সৃষ্টি সম্পর্কে আক্ষেপ করেছিলেন, সে সময় কবি গোলাম মোস্তফা পূর্ণবিশ্বাসের অভিমান এবং উচ্ছ্বলতা নিয়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা পাঠ করলে বিশ্বাসের একটি গভীর অনুশাসন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের কবিদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। সমালোচনাও করেননি। তিনি শুধু তাঁর নিজের মত করে বিশ্বাস ও সত্যকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। নজরুল ইসলামের মধ্যে এক প্রকার বিক্ষব্ধতা ছিল যেটি গোলাম মোস্তফার মধ্যে নেই। তিনি সহজ–সরল এবং নিশ্চিন্ত । তিনি অনিশ্চয়তায় ভোগেন না।, সংশয়ও তাঁর মধ্যে নেই। বিশ্বাসের আবেগ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য বলে গেছেন।[২]

---

১. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, কবি গোলাম মোস্তফার লেখায় জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব কিছুরই উপরে তাঁর অপরিসীম ধর্মপ্রীতি, ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে আজীবন। কবির পারিবারিক পরিবেশ, তাঁর সময়ের মুসলমানদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয় ঐতিহ্য তাঁর রচনায় ইসলামী প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

তিনি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম ও মুসলিম প্রেমিক ছিলেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত ইসলাম প্রেমিক সাহিত্যিক বিরল। তাঁর এই আদর্শের শেষ উত্তরসুরী ছিলেন ফররুখ আহমদ। ছেলে বেলা হতে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কখনোই তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি। তাঁর সাহিত্যের ভিত এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলায় সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ ইচ্ছা করলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নিজেরাও স্বাধীন হতে পারে। তিনি তাই মনে প্রাণে কামনা করতেন পরাধীন ভারতে নিষ্প্রাণ মুসলমান সমাজে ইসলামী বিপ্লব আসুক। সেই ইসলামী বিপ্লবই একদিন পাকিস্তান আন্দোলনকে সুদৃঢ় করেছিল।

তিনি সরকারী চাকুরীজীবি ছিলেন বিধায় প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও লেখনীর মাধ্যমে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ের তাঁর অনেক রচনায়ই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গোলাম মোস্তফা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য রচনা দৃষ্টির সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন নয়। তিনি ইসলামিক বিষয়কে অবলম্বন করেছেন স্বসম্প্রদায়নিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে। কারলাইল বলেছেন–একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণায় সিদ্ধি লাভ করিলে যতটা তিনি স্বীকৃতি এবং পুরস্কারের আশা করিতে পারেন, একজন লেখক তাঁর সাহিত্য সাধনায় সাফল্য লাভ করিলে তাঁহার পক্ষে স্বীকৃতি ও পুরস্কার পাওয়া ততটাই সুদূর পরাহত। কারলাইল যেভাবে সাহিত্যিকের সাফল্যের কথা বলেছেন কবি গোলাম মোস্তফা হয়তো সেভাবে সাহিত্য সাধনায় ফল লাভ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি বাঙালী মুসলিমগণের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে যুগান্তর এনেছিলেন সে কথা

Dhaka University Institutional Repository

কারোরই অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনিই প্রথম বাঙালী মুসলিম সমাজে গীতিকাব্যের দৃশ্যপট উত্তোলন করেন, এর জন্য নিজ সমাজের কাছে তাঁর যে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাবার কথা ছিল তা তিনি পাননি।

স্বধর্মের প্রতি তাঁর যে অবিচল আস্থা আনুগত্য ও বিশ্বাস ছিল তা তিনি সকলের মাঝে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তিনি চাইতেন সকল প্রকার অনাচার ও কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান হয়ে উঠুক। তিনি মুসলমানগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। এই কারণেই তাঁর কবিতায় স্বধর্মীয় সামাজিক চেতনা বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এতে তাঁর অনেক কবিতা হয়তো পাঠকের নিকট আনন্দের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারেনি। তবু সমাজ জাগরণ ও কল্যাণে তা কাজে এসেছে এবং মানুষের সাধুবাদে ধন্য হয়েছে। একজন সমালোচক এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন– " তিনি কালের দাবী যথাসাধ্য মিটাতে পেরেছেন। এ জন্যেও সাহিত্য সভায় তাঁর মর্যাদার আসন নিঃসন্দেহে।"

তাঁর জাতীয় জাগরণ মূলক কবিতায় মুসলিম মানস ও ইসলামী জাতীয়তার বিকাশ ঘটেছে। এই দিক দিয়ে তাঁর কবি সত্ত্বার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। বহুমুখী প্রতিভাধর গোলাম মোস্তফার লক্ষ্য ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সম্প্রসারণ। তাঁর চিন্তা–চেতনা ইসলামী বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। এর বাইরে তাঁর কর্ম সাধনাকে তিনি বিস্তৃত করার অবকাশ পাননি। সম্ভবতঃ তিনি এর প্রয়োজনও মনে করেননি। ভিন্ন আদর্শ তা জীবনের ক্ষেত্রেই হোক বা সাহিত্য ক্ষেত্রেই হোক তিনি তা সহজভাবে নিতে পারেন নি। তিনি চিন্তা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে আপোষহীন ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আদর্শ ও সত্য নিষ্ঠার ব্যাপারটি বিবেচনা করে লিখেছেন–অনেকের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় বন্ধন ঘটেনি কারণ আদর্শগত কারণে তিনি তাঁদের শিল্প সাধনাকে সম্মান করতে পারেননি। তিনি ভেবেছেন যে, মুসলমান হিসেবে যে বিশ্বাস তাঁর মনে প্রধান এবং প্রবল তা দেশ ও কালের অতীত। ঐ আদর্শকে যারা গ্রহণ করেননি বলে তিনি ভেবেছেন অথবা এ আদর্শের প্রকাশ যাদের কাব্যে তিনি দেখেননি, নতুন জাতি নির্মাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এদের রচনার কোন স্বীকৃতি তিনি দেননি। [কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হয়তো বিরুদ্ধ আদর্শ ও আচারের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করতে পারেননি, কিন্তু তাই বলে তার সঙ্গে আপোষও করেননি। এখানেই তাঁর ব্যক্তি সত্তা ও কবি সত্তার দৃঢ়তা । তাই একথা বলা যায় যে, জাতীয় উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় সাহিত্য নির্মাণের ইতিহাসে গোলাম মোস্তফার অবদান রয়েছে। এই বিষয়ে তিনি এক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি অন্যান্য কবি সাহিত্যেকদের মত আপোষহীন কবি না হলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সাহিত্য জগতে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরস্মরণীয়। যতবার এই প্রতিভা দীপ্ত মহান কবিকে আমরা স্মরণ করব ততবার তাঁর অম্লান সাহিত্যকীর্তি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হবে। তাঁর আদর্শকে আজকের আদর্শহীন সমাজে চির মঙ্গলময় রূপে আমরা দেখতে পাব। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন "তিনি মুসলিম কবিগণকে তাঁদের কাব্যসৃষ্টিকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করতে আহবান জানান। তিনি বলেন, হিন্দু কবিদের অনুকরণ নয়, বরং মুসলমানদের বিশিষ্ট অনুভূতির রুপায়ণেই মুসলিম কাব্য সাধনা সার্থক ও স্বকীয়তা মন্ডিত হবে। "

কবি গোলাম মোস্তফা সারা জীবনই এই আদর্শের অনুসারী ছিলেন। আর তাই তিনি অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ইং।

২। আবদুস সাত্তার (সম্পাদনায়), জীবনী গ্রন্থ (২২), বন্দে আলী মিয়া, কবি গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬ ইং।

৩। আবদুস সাত্তার, সুরভি অন্যতর, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬ইং।

৪। আলমগীর জলিল, শিশু সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ইং।

৫। এ,কে,এম মহিউদ্দিন, কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ইং।

৬। হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমী; ঢাকা, ১৯৯৩ইং।

৭। ড. হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৭ইং।

৮। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান (অনূদিত), সায়্যিদ আমীর আলীর দি স্পিরিট অব ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং।

৯। নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ইং।

১০। কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, মাওলানা ব্রাদাস,ঢাকা, ১৯৯৫ইং।

১১। মুহাম্মদ আবূ তালিব, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন আত্ম জীবনী ও সাহিত্য সাধনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ইং।

১২। গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, মাহফুজা খাতুন (সম্পাদনায়), স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ১৯৬২ইং।

১৩। গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮ইং।

১৪। গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ও কমিউনিজম, আহমদ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৮ইং।

১৫। সাইদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ইং।

১৬। নাসির হেলাল, জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা, সুহৃদ প্রকাশন, ৪৩৫/ক,বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ১৯৯৮ইং।

১৭। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ইং।

১৮। ড. খালেদ মাসুকে রসূল, মুসলিম রেঁনেসার কবি গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৬-১৮ বাবু বাজার, ঢাকা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

২০। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ৩৫ শরৎ গুপ্ত রোড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং, ঢাকা।

২১। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ইং।

২২। ইসলামী বিশ্বকোষ (দশম খন্ড), ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২৩। মুহাম্মদ আব্দুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,১৯৬৪ইং। আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা।

২৪। শাহজাহান মুনীর, বাংলা সাহিত্যে বাংঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারা, বাংলা একাডেমী,ঢাকা-১৯৯৩ইং।

২৫। এ জামান, যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার(প্রথম খন্ড) প্রকাশক, এ,বি,এম, আশরাফ উজ্জামান, ১৯৯৮ইং।

২৬। কবি গোলাম মোস্তফা, মরুদুলাল, আহমদ পাবলিশিং ১৯৪৮ইং।

২৭। গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন, মাহফুজ খাতুন (সম্পাদনায়) আহমদ পবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬২ ইং।

২৮। গোলাম মোস্তাফা, রূপের নেশা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

২৯। গোলাম মোস্তফা, ভাঙাবুক, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮ইং

৩০। কবি গোলাম মোস্তফা, ভোরের আলো, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯৫ ইসলামপুর রোড, ১৯৫৪ইং।

৩১। গোলাম মোস্তফা, বুলবুলিস্তান, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী ৪৫ মীর্জাপুর স্ট্রীট,কলিকাতা ও ৯৫ ইসলামপুর, ঢাকা, ১৯৪৯।

৩২। গোলাম মোস্তফা, আব্দুল কাদির (সম্পাদিত),কাব্য গ্রন্থাবলী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১ইং।

৩৩। মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী, বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, প্রকাশ, অধ্যাপিকা শামসুন নাহার লিলি, বারান্দীপাড়া, কদমতলা, যশোর, ১৯৮৭ইং।

৩৪। ফিরোজ খাতুন (সংগ্রাম ও সম্পাদনা), কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী; বর্ধমান হাউস ঢাকা, ১৯৬৭ইং।

৩৫। Syeed Ali Ashraf, Muslim Tradition in Bengali.

৩৬। William Hunter, Indian Musalmans, The Primier book house, Lahore-1964.

৩৭। উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁ, নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড): আব্দুল কাদির (সম্পাদিত) নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। মোশারফ হোসেন খান (সম্পাদনায়), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান অবদান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮ইং।

৩৯। গোলাম মোস্তফ, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাঃ উর্দু না বাংলা ? মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯৫ ইসলামপুর রোড, ঢাকা।

৪০। মজির উদ্দিন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা।

৪১। গোলাম মোস্তফা, গীতি সঞ্চয়ন, ফিরোজা খাতুন (সম্পাদনা), আহমদ পাবলিশিং হাউস। ঢাকা-১, ১৯৬৮।

৪২। গোলাম মোস্তফা, কাব্য-সংকলন, সৈয়দ আলী আশরাফ (সম্পাদনা), বাংলা একাডেমীঃ বর্ধমান হাউসঃ ঢাকা-১৯৬৭ইং।

৪৩। আল-কুরআন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪৪। আতোয়ার রহমান, শিশু সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ইং।

৪৫। আলী আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং।

৪৬। ড. মোহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় সংস্করণ মে, ১৯৬৫ইং, পাকিস্তান পাবলিকেশন।

৪৭। আবুল কাসেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য, আহমদ পাবলিশিং হাউস ১৯৮৮ইং।

৪৮। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, নিউমার্কেট, ঢাকা-১৯৬৫ইং।

৪৯। R. C. Majumder, History of Freedom Movement in India, Calcutta, 1963

পত্র-পত্রিকা

১। খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তাফা স্মরণ, এপ্রিল-মে-জুন, সংখ্যা।

২। অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদক), ঐতিহ্য, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭(১২বর্ষ ৭-১২ সংখ্যা)।

৩। মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদক) নতুন কলম, সৃজনশীল সাহিত্য সংকলন, জুন ১৯৯৯।

৪। মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা (সম্পাদক)পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ১৪১৮ অগ্রপথিক, ১২বর্ষ ঃ ৭ সংখ্যা, রবিউল আউয়াল ১৪১৮ হিজরী।

৫। মাসিক মোহাম্মদী, পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি শাহ গরীবুল্লাহ, কার্তিক ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

৬। মতিউর রহমান মল্লিক (সম্পাদক), নতুন কলম র্সজনশীল সাহিত্য সংকলন, অক্টোবর ১৯৯৭ইং।

৭। আবুল হোসেন মীর (সম্পাদক), দৈনিক ঠিকানা বিশেষ সংখ্যা,যাঁর পেন্সিলের আঁচড়ে গণ মানুষের অভিব্যক্তি ফোঁটে, ৭ম বর্ষ, সংখ্যা, ১৯৮৪ইং।

৮। 'মাহেনও' আবদুল কাদিরঃ পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐক্য, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ ইং।

৯। 'সওগাত' 'অভিসার' ১৯৩২ইং (১৩২৫ বঙ্গাব্দ), পৌষ সংখ্যা।

১০। আশরাফুল হাবীব (সম্পাদক), কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণিকা, যশোর সমিতি, ঢাকা, ১৯৯০ইং।

১১। The Hindustan Standard. 12th November - 1947.

১২। 'সাম্যবাদী' কার্তিক সংখ্যা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

১৩। নাসির উদ্দিন (সম্পাদক), 'সওগাত' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

১৪। 'মাহেনও' দেওয়ান আব্দুল হামিদ, পল্লী কবি রওশন ইজদানী, পৌষ সংখ্যা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

১৫। নাসির উদ্দিন (সম্পাদক) সওগাত, মাঘ সংখ্যা-১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

১৬। 'মাহেনও' আব্দুল কাদির, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐক্য সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ইং।